মৌসুমী সুর

মৌসুমী সুর

বনমালী গোস্বামী

শান্তি লাইব্রেরী

কলিকাতা

মৌসুমী সুর

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তি লাইব্রেরী
১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ : স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭/১ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং
ব্লকমুদ্রণ : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং

আড়াই টাকা

শ্রীরণধীরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শ্রীনিশীথরঞ্জন দত্ত

শ্রীবিবুধরঞ্জন বিশ্বাস

শ্রীসুনির্মল দত্ত

বন্ধুবর্গেষু

এই লেখকের বই

উত্তর আকাশ

But oh ! my friends, I do not ask to die !

I crave more life, more dreams, more agony !

Midmost the care, the panic, the distress,

I know that I shall taste of happiness.

Once more I shall be drunk on strains divine,

Be moved to tears by musings that are mine,

And haply when the last sad hour draws nigh,

Love with a farewell smile may gild the sky.

—PUSHKIN.

আজ ঘুম ভেঙে উঠে দেখি উষার আলোয় আকাশ লাল। অন্যদিন যখন ঘুম ভাঙে তখন সোনালী রোদে পৃথিবী ঝলমলিয়ে হাসে, কলতলায় ভাড়াটেদের প্রাণান্তকর গর্জনে মনের নীল আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে সুপ্রভাতেই। কিন্তু আজ সব ভিন্ন। কী আরাম নির্মল নিরালা বাতাসে; আরেকটু আগে জাগলে হয়তো পুব-আকাশে প্রভাতী তারাটাকে আমার মনের ভালবাসা জানাতে পারতাম।...উঠেই ছুটলাম নির্জন কলতলার পাশে—সযত্নলালিত পলাশগাছটির দিকে। নবীন বসন্তে তার প্রথম ফুল ফুটেছে এবার লাল রঙের,—আমার বুকের রক্তের মত তাজা টকটকে লাল; উষার বীর্যবান সূর্যের মত, আমার যৌবনস্বপ্নের মত রক্তিমাভ। আলগোছে পলাশফুলটি ছিঁড়ে নিয়ে ঘরে এলাম।

মিনিট দশেক পরেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাঁ হাতে বেহালার বাক্স, পিঠে ঝোলানো থলি আর ডান হাতে টিনের স্যুটকেশ। কী করব, বাড়ীর মালিক নরেন ঘোষাল থাকতে দিলে না আর। ছ'মাসের ভাড়া একশো কুড়ি টাকা বাকি, পুলিশ নিয়ে হামলা করতে আসবে ঘণ্টা দুয়েক পরেই। একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি ঘরের ভিতরে: যদি বেঁচে থাকি, তবে অদূর ভবিষ্যতেই তার টাকা দিয়ে যাব।

কলতলায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আহা, ওই ফুটন্ত পলাশ-গাছে ফুলের আগুন লাগবে, আমিতো দেখতে পাব না। দোতালার ভাঙা কাঠের জানালার ফাঁকে একখানি কালো মুখ,—কুৎসিত। তবু যৌবনরাগে রাঙা। যৌবনে কোন জিনিসটি অপরূপ নয়? সে বাড়ী-ওয়ালার মেয়ে, লক্ষ্মী। ঘৃণা করতাম মেয়েটিকে, কুৎসিত ক্ষুধার্ত বালবিধবা, ওর তৃষ্ণার্ত চাউনি উপেক্ষা করে চলে যেতাম পাশ কাটিয়ে।

হঠাৎ একদিন চমক লাগল। জ্যোৎস্নারাতের প্রথম প্রহরে তখন বুক জুড়ে' যেন আকুল ফুটন্ত যৌবনজ্বালা বয়ে যাচ্ছিল আমার; নরেন ঘোষালের নোংরা বস্তির গোয়াল ঘরগুলোর ভিতরে জৈবিক প্রেরণায় স্ত্রীপুরুষ বাচ্চাকাচ্চাগুলো নিত্যনৈমিত্তিক আহারনিদ্রার তাগিদে তুমুল কোলাহল শুরু করেছে: আমি পলাশগাছের পাশের জানালা খুলে বেহালা তুলে নিলাম। অসীম শান্তির নিবিড় নীল আকাশ, আমার

বুকের অন্তহীন প্রেমের মতো ; দুটি একটি তারা প্রেমবিবশ নায়িকার চোখের তারার মত কাঁপছে।

কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম জানিনা, ছড়ি যখন হাত থেকে নেমে এল আমি জানালা দিয়ে গলা বাড়ালাম আকাশকে দেখতে। আমার প্রেমের আকাশকে দেখতে। চম্‌কে উঠলাম। জানালার নীচেই বসে আমার বাজনা শুনছিল,—সে কে ? বাড়িওয়ালার কুৎসিত কালো বালবিধবা মেয়ে। অশিক্ষিত, অমার্জিত, অবাঞ্ছিত ক্ষুধার্ত তরুণী। লক্ষ্মী।

—কী, কী করছিলে এখানে ?...গলাটা বেশ কড়া করে' শুধালাম।

—এই, এই, শুনছিলাম একটু। এই, মানে,—আমি—ভাল লাগে। কালো মেয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে' ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে' আমার দুহাত চেপে ধরল, গলায় তার আকুল আর্ত মিনতি ঝরে পড়ল,

—দোহাই, আর আসবনা আমি, বাবাকে বলে দেবেন না। আপনার পায়ে পড়ি। পিঠের চামড়া তুলে নেবে আমার। দোহাই— !

ধীরে ধীরে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

—তোমার বাবাকে চিনি আমি। ভয় পেয়োনা, তুমি যখন খুশী আমার বাজনা শুনো। খুব খুশী হয়েছি আমি—

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সে নেই। এরপর আর কোনদিন বেহালা শুনতে আমার জানালার নীচে সে এসে দাঁড়ায়নি। হয়তো দূর থেকে শুনেছে। কী জানি। কিন্তু সেদিন থেকে আর আমি ওকে ঘৃণা করিনি। নরেন ঘোষালের টিনে-ছাওয়া মানুষের বাসের অযোগ্য এই গোয়ালঘরগুলোর কোনো প্রাণী যদি আমার বাজনা ভালবাসে, সে যতই কুৎসিত হোক না কেন আমি তাকে ভালবাসব...! এই বসুন্ধরার সুর যার মন ছুঁয়ে যায়, তাকেই ভালবাসি আমি !

এরপর হঠাৎ গতরাত্রে সে এল আমার ঘরে। চুপি চুপি, রাতদুপুরে, নিস্তব্ধ নিরালায়। ভেজানো দরজা ঠেলে সন্ত্রস্ত বিড়ালের মত ঘরে ঢুকে' আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মেঝেতে বসে' মোমবাতি জেলে লিখছিলাম, হঠাৎ সামনে ওর সচল ছায়া দেখে চমকে মুখ তুললাম,

—ওঃ, তুমি ! আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—চুপ! শুনতে পাবে! ···সন্ত্রস্ত কালো মেয়ে তার কুশ্রী মোটা মাংসল আঙুল তুলে পুরু ঠোঁটে চাপা দিল, চোখ গোল করে শঙ্কায় রহস্যময়ী হয়ে উঠল। আমার বিস্ময় থৈ পায় না।

—আপনার ছমাসের ভাড়া বাকি, তাই না? ফিসফিসিয়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতে সে বলে উঠে,

—কাল সকালবেলাই বাবা পুলিশ নিয়ে আসবে, আপনার বেহালা কেড়ে নেবে। আপনি চলে যান, দোহাই—

সহসা আমার ঠোঁটের কোনে ছোট্ট বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। ওর এত দরদ কেন? ওকি আমাকে ভালবাসে, না ভালবাসে আমার বেহালাকে? নরেন ঘোষালের কানাগলির জঘন্য ঘরগুলোর আবডালে এমন রসবিমুগ্ধা কুৎসিত মেয়ে এতদিন তার ফুটন্ত বাসনা কী অমানুষিক প্রয়াসে চাপা দিয়ে রেখেছে ভেবে নিদারুণ হাসি পেল!···সে চমকে উঠল,

—আপনি হাসছেন? দোহাই আপনার, চ'ল' যান আপনি। বাবার রোষ আপনার বেহালার উপরেই। ওটা বিক্রী করে' বাড়ীর ভাড়া আদায় করবে। কি, কথা বলছেন না যে?···তারপর সেই বালবিধবা অবহেলিত অসুন্দর মেয়ে হঠাৎ আমার হাত জড়িয়ে ধরল তার কর্কশ হাতের মুঠোয়, তার বড় বড় চোখদুটি জলে টলটলিয়ে উঠল, পুরু ঠোঁট দুটি থরথরিয়ে কেঁপে উঠল কোন নিপীড়িত গোপন আবেগে।

—এ আমি সইতে পারবোনা, কক্ষনো না। কাল সকালেই চলে যান আপনি। যেখানে খুশী। এই রইল আপনার গাড়ীভাড়া। ··· হঠাৎ সে হাঁটুভেঙে আমার পায়ের কাছে বসে' পড়ল। আঁচল খুলে একরাশ খুচরো পয়সা মাটিতে ঢেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর অপরাধী শিশুর মত নিঃসাড়ে দরজা খুলে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল স্বপ্নের মত। ··· কিন্তু স্বপ্ন নয় তো, একরাশ পয়সা মাটিতে পড়ে। নিশ্চয় একটু একটু করে' বহুদিনে সঞ্চয় করেছিল সে। উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে গুণে দেখলাম আমি—প্রায় দশ টাকা। ··· মোমবাতিটা নিভে আসছে। ঝুনঝুন শব্দে মেঝেতে খুচরোগুলো ঢালতে ঢালতে শুয়ে শুয়ে গুনগুন স্বরে গান গাইছি, মুচকি হেসে,··· দপ্ করে বেরসিকের মত বাতিটা নিভে গেল। অন্ধকার।

এখন রাঙা আলোয় ভাঙা জানালার ফাঁকে ওই একখানি

সুশ্রী মেয়ের মুখ দেখে থমকে দাঁড়ালাম আমি। ওর বুকে তোলপাড়-জাগানো কোনো অনুভূতির ঢেউ যদিও বা জেগে থাকে, ওই কালোমুখে তার কোন ছায়া প'ড়তে পারলাম না নীচে থেকে। নীরব একটু হেসে বেহালাসমেত হাতটা একটু তুলে ধরলাম। সে নড়ল না।

নিঃশব্দে পথে এসে দাঁড়ালাম। আকাশেবাতাসে পবিত্র প্রভাতী সুর। এতক্ষণে কাছেই কোথায় ভোরের পাখি ডেকে উঠল।

বড় রাস্তায় পৌঁছেই এক রিক্সাওয়ালার মুখোমুখী পড়লাম।

—আইয়ে বাবুজি! ··· রিক্সায় চড়ে' বসলাম। ফুরফুরে বাতাসের ভোরবেলায় নীল আকাশের নীচে নিরালা প্রশস্ত রাজপথে আমার বাসনার রথ যেন ক্ষুধার্ত মানবাত্মার কাঁধে ভর করে' দিগ্বিজয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারি ভাল লাগল, বরেণ্য বীরের মত দু'পাশের উঁচু ঘুমন্ত বাড়িগুলোর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে গান ধরলাম খুসীতে। ঘণ্টাখানেক পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম। এখান থেকেই পনেরো মাস আগে একদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম জীবনের উদ্দেশে, সার্থকতার খোঁজে। আজ আবার ফিরে' এসেছি কোনো চিন্তা না করেই। মালপত্র টেনে ভিতরের স্যাঁৎসেতে উঠান পেরিয়ে সরু সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। কে ডাকল,

—রবীন? তুই কোথা থেকে এলি আবার?

চিনলাম মুহূর্তেই। সমীর। আরো রোগা হয়েছে; আগে ওজন ছিল একাশি পাউণ্ড, এখন হয়তো আরো কম। তেমনি লম্বা বাবড়ি চুল, ঝকঝকে শানানো চোখের দৃষ্টি, ধনুকের মত বাঁকা গোফ: সে এতো ভোরেই ওপাশে কলতলা থেকে স্নান সেরে খালি গায়ে ভিজে কাপড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে। জড়িয়ে ধরলাম তাকে,

—এলাম রে। আবার আসতে হলো। ··· পলাশ ফুলটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

—সে তো দেখ্‌ছিই; কিন্তু ছিলি কোথায় এতদিন, দিল্লি, বোম্বাই? আমরা ভাবি,

—না, না, দূরে কোথাও নয়। এ সহরেই ছিলাম। সব বলবো, উপরে চল,

সরু নোংরা গলির প্রান্তে বিগত শতাব্দীর হাড় জিরজিরে চারতলা বাড়ী। দেড়শোর উপর লোক মেস্ করে থাকে এখানে। নীচের তলায় অনেক ধরণের দোকান আর গুদাম। লণ্ড্রী, প্রেস, দরজীর ঘর, ক্লাব।

উঠানের উত্তরপ্রান্ত থেকে অন্ধকার সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে চারতলায়। আর ঠিক চারতলার বারান্দায় সিঁড়ির মাথায় সেই ঘর, সাত ফিট লম্বা ছয় ফিট চওড়া। দক্ষিণে দরজা আর উত্তরের গলির দিকে মুখ করে শিক দেওয়া কাঠের জানালা। জানালার নীচে গলির উপর মুসলমানদের ছোট ছোট খুপড়ি, দিনরাত বসে' বসে' জুতো তৈরী করে তারা, কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধে প্রথম প্রথম আমার গা বমি বমি করত সব সময়। এর পরেই মস্ত আরেক তিনতলা বাড়ি। আমরা বাড়িটার নাম দিয়েছি 'জাহাজ'। নোংরা বুড়োটে অথর্ব জাহাজের মতই তার চেহারা। বার্ধক্যের বেদনায় ধুঁকতে ধুঁকতে ভরা ডুবির দিন গুনছে যেন বেচারী। ছোট বড় ভাড়াটে মিলিয়ে প্রায় শ'দুয়েক লোকের বাস সেখানে। চওড়া বারান্দায় চট্ টাঙিয়ে ঘর তৈরী করে' মেয়েপুরুষ থাকে সেখানে; যেখানে নতুন শিশু পৃথিবীর মুখ দেখে আর দীর্ণজীর্ণ বুড়োরা কাৎরাতে কাৎরাতে হঠাৎ এক সময় স্তব্ধ হয়ে চোখ বোজে। দিনরাত চলে জল আর বাথরুম নিয়ে লাঠালাঠি। জানালা খুলে আমরা তাই দেখতাম যখন তখন।

সমীর বারান্দার তারে ভেজা কাপড়গুলো মেলে দিয়ে দরজায় ঠেলা দিল।

—মন্দিরে আমি ছাড়া আরো সাতজন পূজারী ঘুমোচ্ছে। তোকে নিয়ে এবার নবরত্ন সভা জমবে ভাল। আরে আয়! ঘাবড়ে গেলি এতেই!

সমীর আমার হাত ধরে টানল। বেহালা ও পোটলাপুটলী বারান্দায় রেখে ভিতরে পা ফেললাম। ঘরের বাঁদিকে হাত চার উঁচু এক মাচা তৈরী করেছে তারা। সেখানে নাক ডাকাচ্ছে দু'জন। নীচে বাক্সপ্যাঁটরার ধার ঘেঁসে কোনরকমে শুয়ে রয়েছে বাকি পাঁচজন। এরকম ভিড় এই ঘরে এর আগে কখনো দেখিনি। সমীর ততক্ষণে গায়ে সার্ট চাপিয়ে পায়জামা পরছে।

—আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হচ্ছে রে!

—কোথায়?... মাটি থেকে দৃষ্টি তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপাগলায় আমি শুধাই। ওরা তেমনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নাক ডাকায়।

—বরানগরে এক ফ্যাক্টরীতে কিছুদিন হল কাজ করছি। রাত্রে ফিরবো। ধারালো নাকের ডগা ফুলিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকায় সমীর, তার সেই বিশেষ ধরণের কঠোর হাসি হাসে।

—ও:!... আমি ধপ্ করে' একটা পুরনো ট্রাংকের উপর বসে' পড়তেই সেটা কড়মড় শব্দে বিকট আর্তনাদ করে উঠল। আমার পায়ের কাছের

ঘুমন্ত একজন চমকে তার উপুড় করা মুখ তুলে ধরল। লাফিয়ে উঠলাম,

—দীপেন!

আমাদের মাঝে দীপেনই সবার চাইতে প্রাণবন্ত ছেলে। সবচেয়ে জোয়ান, সবচেয়ে হাসিখুসী। কবিরাজী পড়ছে। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মহা গোলমাল জুড়ে দিল।

—আবার ফিরে এলি তো তোর "ভাগ্যবান নিকেতনে!" আগেই বলেছিলাম আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ! —ক্ষেপার মত হেসে চলে সে আমার চোখে চোখ রেখে। "ভাগ্যবান নিকেতন" নামটা আমারি সৃষ্টি, ভ্যাগাবণ্ড্ থেকেই ভাগ্যবান নামের প্রেরণাটা এসেছিল অবশ্যি। ··· চটিতে পা গলিয়ে আদেশ জানালো সমীর,

—বিকেলে কেউ বাড়ী ছেড়ে বেরোবে না, আমি ফিরে এলেই উৎসবে বেরোব আজ। রবীনের ফিরে আসার উৎসব।

—কিন্তু ট্যুইশানে যেতেই হবে আমাকে। ওই ত্রিশ টাকার ট্যুইশানই একমাত্র সম্বল এখন।... আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

—মাই অর্ডার স্ট্যান্ড্স্!··· উবু হয়ে চটি থেকে একটা অবাধ্য মাকড়সাকে ছুঁড়ে ফেলে ধীর গলায় বলল সমীর, তারপর ফটাশ্ ফটাশ্ শব্দে বারান্দায় চটির সাড়া জাগিয়ে চলে গেল। একমণও ওজন নয় হতচ্ছাড়ার, তবু ওর কথার ওপরে কথা বলতে পারি না কেউ। ওর ঝকঝকে রোষহীন চোখের দৃষ্টিতে কী যে আছে! আমাদের সেনাপতি! জেনারেল সমীর!

সেই রাতে মাংস খেয়ে থার্ড ক্লাশে সিনেমা দেখে যখন সবাই ফিরলাম রাত তখন বারোটা। বাড়ীওয়ালার মেয়ে লক্ষ্মীর দেওয়া দশ টাকার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু গেটের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল সবাই। একটি দশ বারো বছরের রোগাটে ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গেটের বাঁ পাশ ঘেঁষে। সিঁড়ির বাতির ম্লান-আলোয় দেখলাম ফর্সা একখানি মুখ, সরলতা মাখা। ডাগর দুটি চোখ, একমাথা কোঁকড়া চুল। দীপেন এগিয়ে গেল, সস্নেহে ওর কাঁধে দুহাত রাখল।

—কী হলো বিজু?— এত রাতে এখানে?

—একবারটি চলুন, কবিরাজদা'!—ছেলেটি প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে উঠল।

—কেন রে?

—বাবার টান উঠেছে আবার।···ছেলেটির চোখে যেন ভয়ের ছায়া ঘনাল।

—কিছু ভয় নেই, আমার সাথে চলে' আয় দেখি। কবিরাজ ওর হাত ধরে' গলিতে নামল। আমরা নীরবে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। দু'পা পিছিয়ে আলতো হাতে আমি সমীরের হাত ধরলাম,—

—কী ব্যাপার বল দেখি?

—ওই ওপাশের "জাহাজে" নতুন ভাড়াটে এসেছেন এক পণ্ডিতমশায়। আমাদের খুব স্নেহ করেন। ওঁর হাঁপানীর টান ওঠে মাঝে মাঝে। এক ছেলে তো দেখলি, আর আছে এক মেয়ে, ওর বড়। বিজয় আর বৈজয়ন্তী ওদের নাম। আমরা বোনের মত দেখি ওকে। গত ভাইফোঁটায় আমাদের সবাইকে ফোঁটা দিয়েছে কিনা! ··· সিঁড়ি ভেঙে কথা বলতে গিয়ে ক্ষীণদেহ সমীর হাঁপাতে শুরু করল। আমরা উপরে উঠে এলাম।

কী অসহ্য ভ্যাপ্‌সা গরম। দরজা জানালা ছুটো খুলে মাচানের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। নয়জন নওজোয়ানের শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘরটা যেন রীতিমত কাঁপতে থাকে রাতদুপুরে সবাই ঘুমুলে। তুমুল হৈ! চৈ ফুর্তির মাঝে আজকের দিনটা কাটল আমার। বন্ধুরা যেন হারানো মানিক ফিরে পেয়েছে। মনে পড়ল, পনেরো মাস আগে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এদের ছেড়ে আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার কাহিনী।

দক্ষিণের বারান্দার কোণায় প্রফেসারের ঘরে মাঝে মাঝে আসতেন এক ভদ্রলোক, নাম করা সেতারশিল্পী। প্রফেসারের সঙ্গে দাবার আসর বসাতেন প্রায়ই। এক শীতের সন্ধ্যায় সংগীত নিয়ে তর্ক চরমে উঠে গেল। দীপেনের সঙ্গে বাজি রাখলাম, আমার বেহালার সুরে সেতার শিল্পীকে টেনে আনতে না পারলে "ভাগ্যবান নিকেতন" ছেড়ে চলে' যাব। বাজালাম। সেদিন যেন আপনভোলা হ'য়ে বাজালাম বেহাগ রাগিনী। চোখ খুলে দেখি সমীর হাসছে। বললে,

—জানিস রবীন, সেতারী ভদ্রলোক প্রফেসরের ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। অশুদ্ধ রাগের সংগীত শুনতে ওর গুরুর নাকি বারণ আছে।··· কিন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি আমি, পোঁটলা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছি।

• •

সবাই ছুটে এলো হাঁ হাঁ করে। শুধু শান্ত ভঙ্গিমায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চাপা নিরুত্তাপ সুরে বলে উঠল সমীর,

—রবীন জানে "ভাগ্যবান নিকেতন" একটি কমনওয়েলথ্। যে কোনো জন যখন খুশী এখান ছেড়ে যেতে চাইলে কেউ তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু তার জন্যে এখানের দরজা চিরকাল খোলা থাকবে। রবীন যদি জীবনে অভিজ্ঞতা চায়, বৈচিত্র্য চায়, সংগ্রাম চায়, যাক না—

ঠিক বলেছে সমীর। তাই চাই আমি। তাই যাব, আধঘণ্টার ভিতরেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে "ভাগ্যবান নিকেতন" ছেড়ে চলে এসেছিলাম আমি। কিন্তু সে পুরোনো কথা। কোন চিন্তা না করেই ফিরে এসেছি আজ আবার।

বিজয় আর বৈজয়ন্তী। সুন্দর দু'টি নাম। রাতদুপুরে মাচায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে নিবিড় অন্ধকারে চোখ মেলে ভাবতে লাগলাম। ডানপাশের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যাচ্ছে একমুঠো নীল আকাশ, আর,—আর কৃষ্ণাতিথির ম্লান একচিলতে চাঁদ, বিগতযৌবনা রূপসীর সকরুণ মুখের ঈর্ষাবিধুর হাসির মত ওদিকে তাকিয়ে মনে পড়ল অতি কুৎসিত একটি কালোমেয়ের মুখ—লক্ষ্মী। ওকে কি আর কোনদিন এ জীবনে দেখবো? ওকি আমায় ভালবেসেছিল?

আমার ঠোঁটের কোনে অতি সরু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। আমরা সবাই এই সংসারে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যা কিছু স্বপ্নের মত আবছা তারই আশায় পাগলের মত ছুটে বেড়াই; আর করুণা-ভিখারী হ'য়ে অতি সহজ-লভ্য বাস্তব জিনিষ যা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, নিষ্করুণ উপেক্ষায় তাকে ঠেলে দিই। কেন? বর্তমানের প্রাপ্য নিয়ে মানুষের আত্মা তৃপ্ত হ'তে পারে না বলে, ভবিষ্যতের মহত্তর অজানাকে মানুষ অধিকার করতে চায় বলে।... কিন্তু ওই দু'টি নাম! বিজয় আর বৈজয়ন্তী। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে বিজয়। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। তেমনি সুন্দর হবে কি ওর বড় বোন,—যার নাম বৈজয়ন্তী, যে অতি গরীব এক পণ্ডিতের মেয়ে, যে রাস্তার ওপাশে মুসলমানদের চামড়ার দোকানের লাগোয়া বিদঘুটে "জাহাজে" অনেক হতচ্ছাড়া জীর্ণপ্রাণ লোকের সঙ্গে দিন কাটায়? ভাবতে ভাবতে আমার চোখ মধুর সুখের আবেশে ঢলে' পড়ল, ঘুলঘুলির ফাঁকে নীল

ওড়নার পটভূমিকায় ক্যাম্বাসে রূপসীর বার্ধক্যগ্রস্ত মুখ আমার দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল।

খুব ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি পাশেই শুয়ে আছে দীপেন কবিরাজ, দু'হাতে চোখ রগড়াচ্ছে। বাকি সবাই ঘুমে অচেতন। বিচিত্র নাসিকা-কোরাসের সুরে ঘর ভরপুর। চাপা গলায় শুধাই তাকে,—কিরে, কখন এলি? ঘুমোসনি?

চমকে ফিরে তাকায় কবিরাজ, বড় বড় লাগচে চোখে আমাকে ভাল করে' দেখে একবার, তারপর ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে বলে উঠে,

—উহুঁ, ঘুম হয় নি একেবারে।

—কেনরে?—আমি আমার সরু ডানহাতটা ওর সবল চওড়া বুকের উপরে রেখে ওর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বলে উঠলাম,

—অসুখ?

—হ্যাঁ, অসুখ।—নীচু গলায় বলেই কবিরাজ অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল,

—মানে, সুখের অভাব। কাল রাতে বিজয়দের ওখান থেকে ফিরে এসেই মাথাটা গরম হয়ে গেছে।

কেন জানিনা আমার বুক হঠাৎ কেঁপে উঠল। সামলে নিলাম, স্বাভাবিক সুরে দীপেনকে শুধালাম, "কেনরে, বলবি না আমায়"?

—বলবো, বলবো! তোকে তো শুনতেই হবে সব।—জোয়ান দীপেন এবার স্বচ্ছ হাসি হাসল গালভরে, "দাঁড়া, তোকে ঘটনাটা বলে রাখি, তাহলে পরে একসাথে আলোচনা করতে পারবো সবাই—"

বসন্তের মধুর ঘুমজড়ানো ভোরে পাশাপাশি শুয়ে চুপিচুপি সুরে দীপেন আমায় যা বলেছিল:

মাস দশেক আগে "জাহাজ বাড়িতে" এসেছেন পণ্ডিতমশাই। গরীবের ঘরে মণিমুক্তা লুকিয়ে রাখা যায় না বেশীদিন, বাইরে থেকে দস্যুর লোভী দৃষ্টি তাকে তাড়া করে' ফিরবেই। পণ্ডিতমশাইর এক স্বর্গতঃ যজমানের পাষণ্ড টাকাওয়ালা সন্তান হর্ষনাথ একদিন আবিষ্কার করে ফেলল অতুল রূপের দেবী তরুণী বৈজয়ন্তীকে। সেই থেকে পিছু লেগেছে; নানান পূজাপার্বনের অজুহাতে ওদের পরিবারে টাকা ঢালছে হর্ষনাথ, বৈজয়ন্তীকে খোলাখুলি আলাতন করছে। দারিদ্র্যের বন্যার তোড়ে যে নিয়মিত বালির বস্তা ঢেলে সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখছে, তার তুষ্টিসাধনে চেষ্টায় ত্রুটি করছেন

• •

না সপত্নী পণ্ডিতমশাই। তার বিরুদ্ধে কিছুই শুনবেন না। সুযোগ নিচ্ছে হর্ষনাথ, গতরাতে সঙ্গোপনে পণ্ডিতমশাইর অসুখের কথাবার্তা বলার ছলে বৈজয়ন্তীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে বৈজয়ন্তীকে প্রায় অপমান করেই বসেছিল। মা-বাবা হর্ষনাথের দয়া-ভিখারী। আর উপায় নেই বৈজয়ন্তীর, তাই দীপেনকে ডেকে বলেছে যদি ওর ভাইরা তাকে দস্যুর অপমান থেকে বাঁচাতে না পারে, তবে ডুবে মরবে সে—

বলা শেষ করে শূন্যে তাকিয়ে রইল দীপেন। আমি চোখ বুজলাম। কল্পনা মনের নীল ক্যান্‌ভাসে যেন জলজলে একটি ছবি হ'য়ে ফুটে উঠল; —বৈজয়ন্তী! যেন নটরাগিনীর নবযৌবনা নায়িকা: বসন্তের পলাশের মতই টকটকে আলাধরানো তার গায়ের রঙ, কপালে বিজয়টীকা, মাথায় সুরপুরীর যোদ্ধার মত উষ্ণীষ, সারা শরীরে লোহার কবচ আর হাতে সোনার কঙ্কণ, শঙ্খ। সে নল রাজার মত ধীর ও অপরাজেয়। হাতে তার করবাল; বীর্যবতী সেই নারী লজ্জার সাজ দেহে মনে পরেনি, যুদ্ধের উন্মাদনায় পাগলের যত সে ছুটে চলেছে শত্রুবিনাশে; কোথায় শত্রু, কোথায় শয়তান, কোথায় নীচ লুব্ধ লুণ্ঠনকারী—

লাফিয়ে উঠে বসলাম, মাচার একপাশ থেকে বেহালা টেনে নিয়ে সুর তুললাম। ককিয়ে উঠল বন্ধুর দল। চা খেয়ে আমাদের নবরত্ন সভা বসল। দীপেন তার কাহিনী শেষ করল।

সমীরের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ উল্টে বসে' রয়েছে সে, আর ডান হাতের আঙুল দিয়ে ক্রমাগত তার সরু লম্বা নাকটা ঠোঁটের ভিতরে ঢোকাতে চেষ্টা করছে। তার এই ভঙ্গি আমার জানা। ভয়ানক উত্তেজিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে সে, বুঝলাম। দীপেনকে সে, সরাসরি প্রশ্ন করল,—

—বৈজয়ন্তী তাহ'লে ঠিক ঠিক কি চায় বলতে পারো?

বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কেশে উঠল জোয়ান দীপেন কবিরাজ।

—পারি। হ্যাঁ, তার মা বাবা চান লোকটাকে হাতে রাখতে, নইলে পেটে টান পড়ে। তাছাড়া ওরা সরলবুদ্ধি লোক, অসহায়। ওদের এই মনোভাব স্বাভাবিক। কিন্তু বৈজয়ন্তী চায় তার মা বাবাকে না জানিয়ে লোকটাকে শিক্ষা দিতে, তাড়াতে; আর তা করতে হবে আমাদেরি!

—কিন্তু লোকটাকে দেখেছি যে আমি! সমীর নাকটাকে টানতে টানতে

প্রায় মুখের ভিতরে এনে ফেলেছে এবার। সেও সহজ পাত্র নয়। অনেক দূর যেতে প্রস্তুত আছে সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু দীপেন জোরে জোরে বিড়িতে টান দেয়। সমীর নাকটা টেনে টেনে লাল করে তোলে। হঠাৎ আইনের ছাত্র অনিল অতীতকালের আর্কিমিডিসের মতই হাত পা ছুঁড়ে' লাফিয়ে উঠল,

—পেয়েছি, ইউরেকা!

—কি পেয়েছিস র‍্যা!—আমরা প্রায় ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আধঘন্টা ধরে কানে কানে কথাবার্তা চলল আমাদের। আড়মোড়া ভেঙে সমীর উঠে পড়ল,

—এবার যেতে হবে আমাকে। তোরা যে মক্কায় খাবি আর মসজিদে ঘুমাবি তার জোগাড় করতে হবে তো—

সমীরকে জেনারেল বলে ডাকি আমি। হেসে উঠোনা যেন, ওজন তার কমতে কমতে পঁচাত্তর পাউণ্ডে নেমে আসতে পারে, কিন্তু প্রতাপ কমেনি একরতি, দিনদিন বাড়ছেই শুধু। তাই যখন চটিটা পায়ে দিয়ে একমাথা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হেসে খুসীর গলায় বলে উঠল সমীর,

—যাই বলরে, অনেকদিন তেমন মারধোর করিনি, এবার জমবে ভাল! —তার কথা শুনে আমরা কেউ বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলাম না। ফট্‌ফট্‌ চটির আওয়াজ তুলে চলে গেল সমীর।

দু'টি ছেলেকে এবার নতুন দেখছি। পাঁচ ফিট লম্বা ফর্সা চেহারার একটি ছেলে। দেখলে মনে হয় বিধাতা যেন মানুষতৈরীর কারখানার গরমে হঠাৎ দিশা হারিয়ে ভুলে মেয়ে গড়তে গড়তে ছেলে গড়ে' ফেলেছিলেন। মেয়েদের মত সরু গলা, নরম হাত পা। বছর আঠারো বয়েস, নতুন কলেজে ঢুকেছে। কিন্তু বিক্রমে নাকি অভিমন্যু। বেঁটে খাটো বলে সবাই ওর নাম দিয়েছে বাঁটু। আর অন্য ছেলেটির নাম কনক। দীপেন যোগাড় করে এনেছে, কোথায় যেন কম্পাউণ্ডারী শিখছে গোবেচারী ছেলেটি।

ঠিক হল আগামী শনিবার অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার সন্ধ্যায় কীচক-বধ পালা সম্পন্ন হবে। সমীর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলল,

—দেখো যেন বৈজয়ন্তী কিছু জানতে না পারে—

এরপর আমরা হর্ষনাথের কাছে বৈজয়ন্তীর নাম দিয়ে জাল চিঠি একটি রচনা করে পাঠিয়ে দিলাম। দূত হল চায়ের দোকানের দশ বছরের ছেলেটি।

চিঠি পেয়েই ক্ষেপে গেল লালদার দস্যুটি, পরদিন নির্দিষ্ট 'জায়গায় ছেলেটির কাছে চিঠির জবাব দিয়ে গেল।—হ্যাঁ, সে প্রস্তুত, শনিবারেই।

বাঁটু শাড়ি ব্লাউজ জোগাড় করে চমৎকার মেয়ে সাজল; অমাবস্যার কালো কুটিল সন্ধ্যায় গঙ্গার জলধারা ঘেঁষা বড় বটগাছের তলায় নিশ্চুপ বসে রইল। আমরা দূরে ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। ঠিক সময়ে ট্যাক্সি চড়ে হর্ষনাথ এল, অন্ধকার নির্জনে নিশ্চিন্তে বাঁটুর কাঁধে হাত রাখল। তখুনি ছুটলাম আমরা, ওদের কাছে গিয়ে বিড়ি খাবার অছিলায় দেশলাই জালল ঢ্যাঙা ট্যারা তপেশ, তারপরেই: আরে! এ আমাদের পাড়ার বৈজয়ন্তী নয়? দেখো, দেখো, কোন বদমাস গরীব পণ্ডিতের মেয়েকে টাকার জোরে ভুলিয়ে এনেছে, ছিঃ!…এর পর শুধু হোঁৎকা হর্ষনাথের হাতজোড় করে' কাতর কাকুতিমিনতি। তপেশ ওর মাংসল পিঠে চিমটি কাটছে। ততক্ষণে বাঁটুও উধাও হয়ে সাজ পাল্টে এসেছে, বসিয়েছে হর্ষনাথের পিছে প্রচণ্ড লাথি,—'নাকে খৎ দে বদমাস!—নরম কাদায় পড়ে সৌখীন বেচারী হর্ষনাথ গড়াগড়ি যেতে লাগল। দীপেন শাসাল,—আর যদি আমাদের পাড়ায় ঢুকতে দেখি, দেখছিস তো গলির মুখে কালীমন্দির, ওখানে পাঁঠা হ'তে হবে।… দীপেন সারাক্ষণ একটা চকচকে ছুরি নাচাল ওর ধ্যাবড়া নাকের সামনে। এরপর চিমটি, লাথির কাদায় গড়াগড়ি দিতে হ'ল বেচারীকে।

মেসে যখন ফিরে এলাম রাত তখন প্রায় দশটা। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল সমীর। মিনিট কয়েক পরে, তখনো আমরা কাপড় ছাড়িনি, দরজার সামনে কে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল।

—কে? লাফিয়ে এগোল দীপেন কবিরাজ।

—আমি!—ফুটফুটে ছেলে বিজয় স্মিতমুখে হাসল,

—আরো দুবার এসে খুঁজে গেছি আপনাদের।

—কেন রে? হাঁপানীর টান উঠল আবার?

—না, না! ও কেন উঠতে যাবে! মা পাঠিয়ে দিলেন, শনিপুজোর প্রসাদ খেতে যাবেন আপনারা!

—ওহো, তাইতো! আজ শনিবার!—হো হো করে অর্থহীন আনন্দে হেসে ওঠে সমীর।—'তুই যা বিজু, আমরা এলাম বলে।'

কিন্তু কী প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে আমার। চোখ বুজে আসছে আপনা থেকে, চোয়াল দু'টো যেন ক্লান্তিতে ঘুমের জড়তায় শক্তিহীন হয়ে ঝুলে পড়েছে।

শরীরের যত গ্রন্থি সব যেন আলগা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ঘুম। ঘুম। ঘুম। কিন্তু ওরাতো শুনবে না। অনর্থক তর্কাতর্কি। টলতে টলতে সবার পিছনে চলতে থাকি আমি। চোখ বুজে আসছে বারবার, ঝিমিয়ে পড়ছে চিন্তাশক্তি। ঘুমের সাগর গ্রাস করছে আমাকে।

রাস্তা তখন জনবিরল, শুধু সিগারেটের দোকানে রেডিওর সুরবিস্তার। পথের মানুষ, অনেক দিনমজুর, ছেলে মেয়ে বুড়ো—রাস্তার কিনারে শুয়ে পড়তে ব্যস্ত। একটা বুড়ো শুয়ে শুয়ে রোগের যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে, একটি মা তার দুই বাচ্চাকে শাসন করছে তারস্বরে, মারছে দমাদম, বিড়ি টানতে টানতে গালগল্প করছে লোকগুলো। গান গাইছে একটি মাতাল। রাস্তায় পাতা সংসারে সাবধানে পা ফেলে এগোই আমরা। "জাহাজের" লোনাধরা গেট্ দিয়ে ভিতরে গেলাম। প্রকাণ্ড উঠান: ভাঙ্গা খাট টেবিল পিপে আর হাজাররকম জঞ্জাল রাশিকৃত করা, একটা মিশ্রিত ভ্যাপসা গা বমি বমি করা গন্ধ উঠছে সব কিছু থেকে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠি। নয়জন নওজোয়ান। দিশাহারা অশান্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি। যৌবনরাগে টলোমলো বিক্ষুব্ধ বসন্ত প্রভৃতির যেন নয়টি রক্তবর্ণ পলাশফুল। যার বুকে আর মগজে দাউদাউ আগুন। অশ্রান্ত সৃষ্টির আর অশান্তির।

ঘুম। আমার দু'চোখ যেন ডুবিয়ে দিলে ঘুমের বন্যায়। তবু মিটমিটে চোখে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি নোংরা পরিবেশ: গন্ধ উঠা চটের পর্দা আর নোংরা হাঁড়িখুড়ি। শুনতে পাচ্ছি পুরুষনারীর মিলিতস্বরে ঝগড়ার বিষাক্ত কোরাস, বুড়োদের কাৎরানি আর শিশুদের মিনমিনে কান্না। ঘুম। ঘুম। ঘুম।

সবার পিছনে থপ্‌থপ্‌ পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি আমি। তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে দরজাটা খোলা। সংকীর্ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা। ভিতরে লণ্ঠনের লাল মিটমিটে আলো। চমৎকার ধূপের গন্ধে বাতাস মধুময়।

—এসো বাবা, তোমরা এসো। ভিতর থেকে কাঁপা কাঁপা স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান। সবাই জুতা খুলে ভিতরে ঢুকলো।

ছোট ঘর। বাক্স প্যাটরা আর একখানি তক্তপোষে সবটুকু জুড়ে আছে। কিন্তু "জাহাজের" সেই তেলচিটচিটে গা বমি বমি করা পেটেণ্ট গন্ধটা পাচ্ছি নাতো! ঘরের বাতাস ধূপের সুরভিতে মোহময়। সাদা ধপ ধপে

বিছানায় বসে আছেন বুড়োটে পণ্ডিতমশায়। বাঁ হাতে হুঁকো। চোখে বিবর্ণ ভাঙা নিকেলের চশমা, সুতো দিয়ে মাথার পিছন দিকে বেঁধে আটকানো। রোগা, শুকনো ব্যাধিজীর্ণ অবসাদগ্রস্ত মুখে সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিছানা থেকে নামতে নামতে ব্যস্তকণ্ঠে হাঁক ছাড়লেন তিনি,

—বিজু, ভিতরে বলে আয় ওরা এসেছে।

সেই ছোট ঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। সবুজ পর্দা ঝুলছে দরজায়। তার ওপাশে বোধ হয় রান্নাঘর। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই নিমেষে আমার ঘুমের চাঁদ অস্তমিত হ'ল।

পর্দাটার বাঁ পাশে প্রায়-ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক। সেইখানে এসে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়েছে কে, নুয়ে নুয়ে কী করছে। লণ্ঠনের লাল আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সুডোল হাতের টকটকে কাঁচা সোনার রঙ, আর ডানদিকের গালে ক'গাছি চুলের লুটোপুটি। এতো রঙ! এতো সোনা! সেই মুহূর্তেই সবুজ পর্দা ঠেলে সে ঘরে ঢুকলো।

—বাবা, তোমার আসন দেয়া হয়েছে। খেতে যাও তুমি!

—যাই, মা! তিনি হাসলেন। ... 'তোমরা বস বাবা, কিছু মনে করোনা'!

—না, না। দীপেন কবিরাজ প্রতিবাদ করে উঠল প্রাণপণে,

—এমনিতেই অনেক দেরী করেছেন আপনি। দশটার আগে শুয়ে পড়তেই হবে আপনাকে সবদিন!... পণ্ডিতমশাই খড়মের শব্দতরঙ্গ তুলে পর্দার ওপাশের ছোট্ট রান্নাঘরে চলে গেলেন।

এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বৈজয়ন্তী। সবার মুখে নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বচ্ছ হাসি হাসছে। এতো রূপ! অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে দুর্বলশিখা লণ্ঠনটা নিবিয়ে দেয় না কেন বৈজয়ন্তী? ওর অতুল রূপের ছটাতেই সব জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে—অন্তত আমার হৃদয়!

ঝুঁকে পড়ে নীচে লণ্ঠনটা রেখে মেঝেতে একটা সতরঞ্চ বিছিয়ে দিতে লাগল সে। আমি সুরমুগ্ধ সাপের মত অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবন্ত ওই প্রতিমা থেকে দিব্যযৌবনের পবিত্র সুর জেগে উঠছে ছন্দে ছন্দে। সতরঞ্চ বিছিয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠল সে,—

—বাঃ, আবার গলবস্ত্র হয়ে তোমাদের আমন্ত্রণ করতে হবে নাকি! রাত দশটায় এসেছো বোনের বাড়ী। কোন্ পতিতকে উদ্ধার করে' এলে ভাগ্যবানরা, শুনি?

হুড়মুড়িয়ে সবাই বসে পড়ল। ফিসফিস সুরে দীপেন বলল চোখ গোল করে,

—জানিস বৈজয়ন্তী, আমরা আজ অমাবস্যার রাত্রে কীচক বধ করে এলাম।

অমনি সমীর ওর উরুতে চিমটি কাটল, চাপা গর্জন ছাড়ল,

—চুপ কর্, ইডিয়ট!...বিকট চীৎকার করে উঠল জোয়ান কবিরাজ, কিছু না বুঝতে পেরে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

সে তার গাঢ় অতলান্ত নীল চোখ দু'টি তুলে তাকাল সমীরের চোখে,

—কি হয়েছে সমীরদা?

—কিছু না রে! সমীর ঠোঁট চেপে হাসল একটুখানি,

—হর্ষনাথকে বেশ একটুখানি শাসন করে' এলাম। আর যেন এদিক না মাড়ায়। কিরে, অন্যায় করেছি?

—তোমরা কি অন্যায় করতে পার, তোমরা কি অন্যায় করবে কোনদিন? —তার অতুল রূপরাশি নিয়ে সে সোজা দাঁড়াল। একটু শ্বাস ফেলার শব্দ। বাতাসের শিসের মত এবার তার গলার সুর,—

—শুধু বাবা একটু খোঁজ করবেন আর কি! এইতো আজ সারাদিন বলছিলেন,—কই, হর্ষ এলো না একবারও! ওর দয়াতেই তো বেঁচে আছি—

সবার পিছনে বসে' শুধু দেখছিলাম মানুষের কী পরিমাণ রূপ থাকতে পারে। ওই অষ্টাদশী মেয়ে স্বর্গের বৈজয়ন্তীমালার মতই সুদুর্লভ, পরম রমণীয়। নারায়ণের কণ্ঠ ছাড়া এই মালাতো আর কারো কণ্ঠে শোভা পাবার কথা নয়। হর্ষনাথের মত অসুর এই সুরপুরীর কমনীয় নয়নলোভন মালাকে ছিনিয়ে নিয়ে শুধু নির্বোধ ষাঁড়ের মত মত্ত লালসায় ছিঁড়েখুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেবে? অসম্ভব!

সে সবুজ পর্দা ঠেলে ওধারে গেল। খানিক পরেই ফিরে এল হাতে প্রসাদের থালা নিয়ে। ফলমূল। একটু সন্দেশ। হাতে হাতে দিয়ে যেতে লাগল সবার। এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেনি, সবার পিছনে ছায়ায় মিশে বসেছিলাম আমি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বিস্ময়াহতের মত থমকে পড়ল সে। চমকে গেল। চোখ ফেরাল সমীর।

—ওহো, মহাভুল হয়ে গেল বোন। ও হচ্ছে রবীন। সেই যে তোকে একটি পাগলার কথা বলেছিলাম একদিন। নামকরণে ওস্তাদ! "জাহাজ"

আর "ভাগ্যবান নিকেতন" ওরই দেওয়া নাম। পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন রাগ করে, ফিরে এসেছে আবার। পাগলা!

—আপনিই তো বেহালা বাজান, তাই না? সে তার অতলান্ত সুনীল চোখের জ্যোতির্ময় দৃষ্টি আমার চোখে রেখে শুধাল, আমি সম্মোহিতের মত মাথা নোয়ালাম। সমীর হেসে উঠল খিলখিল করে।

—ওকে আবার আপনি-আজ্ঞে করছিস কিরে? হুঁ, রবীন পাগলা বেহালা বাজায় অসম্ভব ভালো—

—তাই নাকি?—সেও হেসে উঠে হঠাৎ। কাঁচা সোনার প্রতিমায় ঢেউ জাগে আবার। সুর জাগে ছন্দোবদ্ধ যৌবনের প্রতিমা থেকে। দিব্য যৌবনের আশাভরা সুর। মুখ থেকে যেন একরাশ আলোর ফুলকি ঝরে পড়ে ওর হাসিতে। "তবে আমাকে কবে বাজনা শুনিয়ে যাবে কথা দাও রবীন দা। এই নাও, তুমি আজ প্রথম এলে, পুরো একটা সন্দেশই নাও!"

সে পিঠ সোজা করে দাঁড়াল। আমরা খেতে লাগলাম। কোলের উপর আড়াআড়ি দু'হাত ঝুলিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখতে থাকে সে। সশব্দে আমরা দাঁতে ফল কাটি। শশা চিবানোর শব্দে ঘর মুখর হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে আবার হাসল। করুণ হাসি। যেন পশ্চিম আকাশে গোধূলির আলো।

—আমার ভাইদের পেট পুরে' খাওয়াবার কী যে সাধ আমার, নারায়ণ আর পূর্ণ করলেন না!

—করবেন রে!—সমীর আনারসে কামড় দিয়ে হেসে উঠল,—যখন খুব বড়লোক একটি ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব, তখন ভাইফোঁটায় একটা হেস্তনেস্ত করে বসিস তুই, আমি আশীর্বাদ করে থালাভর্তি সন্দেশ খাব।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে মাথা নোয়াল সে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পরমুহূর্তেই সম্রাজ্ঞীর মহিমায় দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা তুলে ঝকঝকে দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকাল সে,

—রবীন দা! যেদিন তোমার সুবিধা হবে আমায় তোমার বেহালা শুনিয়ে যেও। দেখছো তো, সব পাগলদের নিয়ে কারবার আমার, নিজের মাথাই খারাপ হবার যোগাড়।

—তুই সংগীতের কি বুঝবিরে? আধখানা সন্দেশে কামড় দিয়ে দীপেন কবিরাজ হেসে উঠল বোকার মত। জোয়ান প্রাণখোলা মানুষ দীপেন।

—তাও বটে! সে হাসল। একরাশ আলোর ঝুলকি মিটমিটে লণ্ঠনের আলোকে লজ্জায় ম্লান করে দিয়ে ওর অনিন্দ্য কাঁচা সোনার মুখে ছড়িয়ে পড়ল, নিবিড় অতলান্ত দুই চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—তোমাদের কাউকে বলিনি এতদিন। শোন। আমার এক বড় ভাই ছিল, তোমাদের মত। অদ্ভুত সুন্দর বাঁশী বাজাত সে। গাঁয়ের বাড়ীতে চাঁদনীরাতে যখন পুকুরের পৈঠায় বসে সে সুর তুলতো, মনে হতো আকাশ যেন নীচে নেমে আসছে ওর সুরের টানে। একদিন সাপে কাটল তাকে, আকাশের মতই নীল হয়ে মারা গেল সে। বিজু তখন কোলের শিশু।··· সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, দু'পা এগিয়ে সবুজ পর্দার ধারে দাঁড়িয়ে সজীব সুরেলা গলার ডাক দিল,—মা ওদের খাওয়া হ'য়ে গেছে। পায়েস নিয়ে আসবে?

হেমাঙ্গিনীকে দেখলাম। দুঃখের সংসারের জননী। চুলে পাক ধরেছে। পণ্ডিতমশাইএর অধিক বয়সের তৃতীয় পক্ষের পরিবার। টকটকে রঙ, মুখে সরলতার হাসি। মোটা সোটা। ছেঁড়াকাপড়ে হলুদের দাগ।

—কি অন্যায় দেখো দিকি এতক্ষণ একটিবার তোমাদের দেখে যেতে পারলাম না, রোগী নিয়েই মেতে আছি—

আমরা একসাথে হাঁ হাঁ করে উঠি। বৈজয়ন্তী বলে ওঠে,

—মা, এবার আর ওরা অষ্টধাতু নয়, নবরত্ন। রবীনদা ফিরে এসেছে। ওই দ্যাখো!

আবার তার চোখমুখ জুড়ে আলোর ফিনকি আর কাঁচা সোনার প্রতিমার গায়ে ঢেউয়ের পরে ঢেউ।

মমতাময়ী হেমাঙ্গিনীকে মা বলতে পারলে ধন্য হবে যে কেউ। চোখে মুখে সরলতা, সহজ বিশ্বাস আর স্নেহকরুণার অবিরাম নির্ঝরধারা। মন উথলে উঠল। পায়েস হাতে নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লেন হেমাঙ্গিনী। প্রণাম করলাম।

—আহা, বেঁচে থাক বাবা! হেমাঙ্গিনীর মমতা হৃদয় ছুঁয়ে গেল আমার।

—এদের তো সব কথাই জানি। তোমার সংসারের খবর কি বাবা?

—খবর! আমি এই প্রথম মুখ খুললাম। হাসলাম।—কেউ নেই, মা! শুধু গাল দেবার আর নালিশ জানাবার কিছু আছে। কাঁদবার বা কাঁদাবার কেউ নেই!

চোখ তুলতেই বৈজয়ন্তীর কৌতূহলতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলে

গেল। আমি মাথা নোয়ালাম, পায়েস মুখে দিলাম। আঃ, কি মিষ্টি। ভালবাসার স্পর্শে যেন অমৃত হয়ে গেছে। একটি একটি দানা তুলে কৃপণ ভিখিরির মত মুখে দিতে লাগলাম আমি, পাছে সুদুর্লভ স্বর্গের অমৃতের স্বাদ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। পান চিবিয়ে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করি। বৈজয়ন্তী সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরে। আমি ওকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়িতে পা দিতেই মিষ্টি হাসিতে ওর অপরূপ রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ছায়াঘন গভীর চোখে বর্ণাঢ্য প্রাণের আলো ছায়া ফেলে গেল,

—রবীনদা, শীগগির আসা চাই কিন্তু। দাদা তার জীবনের শেষ বাঁশী বাজিয়েছিল এক চাঁদিনী রাতে। এরপর আর কারো বাজানো শুনিনি। আসবে তুমি ?

থমকে দাঁড়ালাম। নীরবে ওর ভাস্বর চোখের দিকে তাকালাম তারপর মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম। নীচে থেকে ডাকছে সমীর। ওরা সব নেমে গেল। আমি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসব—আসব! আমার নটরাগিণীর নায়িকা: নবযৌবনের প্রতিমা, রক্তবর্ণা, বীরভূষণভূষিতা, যুদ্ধক্ষেত্রে খোলা তলোয়ার নিয়ে ধেয়ে চলেছে সে লাজলজ্জা অন্ধসংস্কারের বেড়াজাল ঠেলে। আসব আমি আসব!

নীচে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি তখনো সে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। বৈজয়ন্তী! নারায়ণের গলার ভুবনভুলানো অমূল্য এই স্বর্গের সুরভিত মালার অপমান করে এমন সাধ্য কার! যৌবনের দেবী—

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রত্ন, ভাস্বরতম দীপ্তি, উদারতম ভাব হচ্ছে যৌবন। পৃথিবী অনন্তযৌবনা, তাই অনন্যা। মহাসমুদ্র যৌবনের রুদ্রশক্তির প্রতীক, তাই জরাহীন। অগ্নি জ্বালাময় যৌবনের উদ্গাতা ঋষি—কুণ্ঠাহীন, ক্ষমাহীন, তাই প্রণম্য। যার যৌবন আছে, সবই তার: সবুজ বসুন্ধরা, আলোময় আকাশ, তরঙ্গময় সমুদ্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বপ্ন। সৃষ্টির অনন্ত উৎসবমুখর সংগীত। যৌবন সত্য, যৌবন সুন্দর, যৌবন কল্যাণময়। যৌবন ছাড়া অন্য ভগবান মানিনে আমি। যৌবন ছাড়া অন্য গান গাইনে আমি। যৌবনের আলোয় বেঁচে আমি মরতে চাই। যৌবনে—

আমি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। ওরা কেউ নেই।

এরপরই নিতান্ত আকস্মিকভাবে আমরা 'ভাগ্যবান নিকেতনে'র ভাগ্যবানরা

খুব বেকায়দায় পড়ে গেলাম। চারমাস মেসের খরচ বাকি পড়েছে। এর উপর আবার নতুন লোক এনেছে সমীর। আজ থেকে আর আমাদের খেতে দেবে না। আর সামনের মাসের প্রথমে ঘরভাড়ার টাকা মিটিয়ে না দিলে ছেড়ে দিতে হবে আমাদের 'ভাগ্যনিকেতন'। মেসের ম্যানেজার তাই জানিয়ে গেল। ··· এরপর দিনরাত উপোস করে' করে' আমাদের মাথা ঘুরতে লাগল। কোলরিজের এ্যান্সিয়াণ্ট্ মেরিনারের মত আমি ক্ষুধাভয়ংকর চোখের সামনে রীতিমত ভুতুড়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সবাই কপর্দকশূন্য। শুধু সিঁড়ির নীচের রমেশ এখনো জলে ভাসিয়ে দেয়নি আমাদের। গেলাস গেলাস বিস্বাদ বিবর্ণ চা খাই যখন তখন। তবু এই তৃপ্তিবিহীন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ভাবি: পূর্ণিমা রাত, সে কত দূর? আমি যে আমার নটরাগিনীর যৌবনদীপ্তা নায়িকাকে বেহালা বাজিয়ে শোনাব!

পাঁচদিন পর রাত প্রায় ন'টায় ফিরেছি ছাত্র পড়িয়ে। ঘরে ঢোকবার পথ পাইনা আর। সবাই লুটিয়ে পড়েছে এখানে ওখানে, দুপুরের শ্রান্তক্লান্ত জিভ-বের-করা বিবশ ভরসাহারা পথের কুকুরের মত। শুধু ফর্সা বাঁটু জানালার ধারে উপুড় হ'য়ে শুয়ে' নির্জীব সুরে মিনমিনিয়ে গাইছে: দে' মা আমায় তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই মা শংকরী—'। ···একটু ফাঁকা জায়গা দেখে ধপ্ করে মেঝেয় বসে পড়লাম। ট্যারা ঢ্যাঙা তপেশ বিড়ি যোগাড় করেছে কোথা থেকে, একটা জেলে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। ··অলস মন্থর পায়ে ক্লান্তিতে অবশ শরীর টেনে টেনে সমীর ঢুকল ঘরে, সবার মুখে এক নজর দৃষ্টি বুলিয়ে সার্টের পকেট থেকে লম্বা একটুকরো কাগজ বের করে ঢোক গিলে বলল,

—আজ পর্যন্ত কবিতা লিখে সম্পাদকের কাছ থেকে মোট তেত্রিশ টাকা পেয়েছি। বুঝলি রবীন, সারা বিকেল কবিতার পাণ্ডুলিপি পকেটে নিয়ে সম্পাদকদের দরজায় হানা দিয়েছি। অগ্রিম একটি টাকা দিতেও রাজী নয় কেউ। শেষ পর্যন্ত এই একটি কবিতা দু'টাকায় বিক্রি করে এলাম। দেয়ালে অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে হাসে সমীর। কবি সমীর। যোদ্ধা সমীর। জীবনযুদ্ধে নির্ভীক অপরাজিত জেনারেল সমীর। সে হাসল ম্লান করুণ হাসি। ফিসফিসিয়ে বলে উঠল,

—আমার বড় প্রিয় কবিতা, ইংরিজিতে লিখেছি এটি। শুনবি একটু?

সবাই ঝিমুচ্ছে। মিনমিনে সুরে গান গাইছে বাঁটু। বাতি জ্বলছে বিপুল তেজে। কী অসহ্য ভ্যাপসা গরম। আর ক্ষুধা? সমীর কাগজটা চোখের সামনে তুলে' ধরল। বাতাস কেঁপে উঠল তার ভারী দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের ছোঁয়ায়—

Friend! Come up to me!
Let me embrace you
And feel the fire in your heart
That guides me and gives me warmth...

সবাই অনড়, নিস্পন্দ, নীরব। আশেপাশের সহস্র গোলমাল ছাপিয়ে ভেসে উঠছে সমীরের উদ্দীপ্ত সুর:

...I love you and I love them
For I dare know
Love triumphs where sword fails...

কখন পড়া শেষ করেছে সমীর বলতে পারি না। অনেক পরে সে যখন খালি গায়ে আমার পাশে এসে বসল, চমক ভাঙল আমার। ওর হাতে হাত রাখলাম।

—দু'টাকা দিয়েছে তো সমীর?

—হ্যাঁরে। চল সবাই, কবিতা-বিক্রির টাকায় খেয়ে আসি একটু—

টলতে টলতে আমরা নয়জন ভাগ্যবান পথে নামলাম একটু পরেই।

পরদিন আবার সেই উপোস। প্রাণঘাতী ক্ষুধা আর মগজের জ্বালা। রাত্রে ছাত্র পড়িয়ে ফিরলাম। ঘরে আছে সবাই, কথা বলছে নির্জীব গলায়। ঘরে ঢুকলাম। হঠাৎ সবাই নীরব নিথর হয়ে গেল। গান থামিয়ে স্তিমিত চোখে বাঁটু তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তপেশ শুধু সজোরে বিড়ি ফুঁকছে। অনিলের খালি কালো গায়ে যেন পেটটা চুপসে ঢুকে গেছে অনেকখানি। দাঁতে ঠোঁট চেপে রোগাটে খাইনের ছাত্রটি চোখের উপর হাত রেখে শুয়ে আছে আমার পায়ের কাছে। কালো বিস্বাদ চায়ের প্রকোপে শুধু গা বমিবমি করছে আমার, মাথা ঘুরছে, গলা চিরে শব্দ বেরোচ্ছে না। একটানা দেড়ঘণ্টা গবেট ছাত্রের কুটিস্তাভর্তি মাথায় জ্যামিতি আর ব্যাকরণের ইন্‌জেকশন্‌ ঢোকাবার অর্থহীন প্রচেষ্টায় আমার সব শক্তি নিঃশেষিত।

কিন্তু ওরা সবাই এমনচোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে কেন বারবার?

আমি কি বিশ্বাসঘাতকের মত হোটেল থেকে মাংস বিরিয়ানি আর দুই সন্দেশ দিয়ে এইমাত্র আশ মিটিয়ে খেয়ে এলাম? আমার কি আকণ্ঠ ভরে গেছে শুধু লোভনীয় পৃথিবীর যত সেরা সেরা খাবার দিয়ে? হায়রে,—আমার যে শরীরের প্রতি অণুতে অণুতে অন্তহীন ক্ষুধার, অতৃপ্ত বাসনার আর লোলুপ রসনার লেলিহান শিখা জ্বলছে, আমি যে ক্ষুধার তাণ্ডবে পাগল হয়ে গেছি, আমি যে ভুতুড়ে দৃশ্য দেখছি! এই তো নীচের রাস্তায় একটা নেংটি কুকুর দেখে ভাবছিলাম, ওটাকে আগুনে ঝলসে নুন দিয়ে যদি খেয়ে ফেলি? কই, এই কথা ভাবতে একটুও তো ঘেন্না হল না আমার? মনে হচ্ছে ছাগলের মত কাগজ খেয়ে ফেলি যেখানে পাই, আর সব আগে খাই সমীরের লেখা গল্প কবিতাগুলো। ওই যে আমি আবার ভুতুড়ে দৃশ্য দেখতে শুরু করলাম: বাঁটু যেন সাদা প্লেটের উপর মস্ত একটা সরস ক্ষীরপুলির মত শুয়ে আছে। সমীর যেন শুকনো ইলিশ মাছের ভাজার টুকরো। ট্যারা তপেশ যেন ফ্রাই আর কালো অনিল কাটলেট। মনে হচ্ছে সবকটাকে গিলে ফেলি ধরে' ধরে'—ক্ষুধা জুড়োক। ক্ষুধা! তবে কেন ওরা আমার দিকে অমন ভীরণ চোখে তাকাচ্ছে?

—রবীন, একটা কাজ পারবি? হঠাৎ বলে উঠে সমীর।

আমার মাথা জ্বালা করে উঠল। পেটের ভিতরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন হু হু করে মোটরের চাকার মত ঘুরে চলেছে অনবরত। ওরা তাকাচ্ছে আমার মুখে। যেন তক্ষুণি লাফিয়ে পড়বে আমার উপর, ক্ষুধা-হিংস্র নেকড়ের মত ছিঁড়েখুড়ে খেয়ে ফেলবে আমাকে।

—আমি কি করবো? এ্যাঁ? তুই কি বলতে চাস সমীর?

—বলতে চাই, সমীর একটা ঢোক গিলল,—লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া আর সবই করেছি। এখন শুধু তুই-ই বাঁচাতে পারিস!

—আমি? বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে যাই।

—হ্যাঁ, তোর বেহালাটা যদি দিনকয়েকের জন্যে বন্ধক রাখিস রবীন!—আমার প্রিয় নির্ভীক জেনারেলের কণ্ঠে যেন অতি দীনহীন ভিখারীর আর্ত মিনতি ঝরে পড়ল নিঃসঙ্কোচে। আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম। এ কেমন করে বলতে পারল সমীর? ও কি জানে না? সবই জানে। তবে?

—রবীন? অনিলের মোটা গমগমে গলার স্বর আমার কানের কাছে

বেজে উঠল। সে উঠে বসেছে আমার মুখোমুখি। কালো চামড়ার নীচে পেটটা ঢুকে গেছে কতখানি! হতভাগা!

—রবীনদা? ছেলেমানুষ ফর্সা চেহারা বাঁটুও উঠে বসেছে, চোখে মুখে পথের ভিখারীর আকুলতা। নেড়ী কুকুরের মত খাবারের প্রত্যাশায় লেজ নাড়ছে না কেন হতচ্ছাড়া ভ্যাগাবণ্ডরা! ভাগ্যবান নিকেতনের ভাগ্যবানরা!

—পাঁচদিন কেউ খাইনিরে, শুধু চা আর পচা বিস্কুট! সমীর আবার ভিখারী হয়ে গেছে। আমার প্রিয় সমীর! জানি, পেটের জন্যে লোক যেমন নিজের সন্তানকে, স্ত্রীকে বিক্রী করে দেয়, এও ঠিক তাই! তারও বেশী হয়তো। কিন্তু আমাদের কাছে যে বন্ধক দেবার মত আর—

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ঝিমানো শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলাম,—শাট্ আপ্! গোটা পুরোনো বাড়ীটা বুঝি কেঁপে উঠল, ওরা সবাই লাথি খাওয়া কুকুরের কত আর্তচোখে চমকে তাকাল। আমি লাফিয়ে উঠলাম, দু'হাত উপরে ছুঁড়ে ভেংচিকেটে বললাম,—পেটের ক্ষুধায় মানুষকে খেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, আর লেকচার ঝাড়ছে ভাখো না! শীগগির চল্ কোথায় নিয়ে যাবি! ... একটানে মাচার উপর থেকে বেহালার বাক্সটা তুলে নিলাম। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। হায় নীল স্বপ্ন! তোমাকেও মাঝে মাঝে কঠোরবাস্তবের মধ্যাহ্নে নেমে আসতে হয় নীলআকাশের চাঁদনী ছেড়ে! সবাই খুসীতে লাফিয়ে উঠে গায়ে জামা চড়াল। দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে সমীর হাসল,

—মোটে বারদিন, রবীন। বুঝলি, মোটে বারদিন। তোর ট্যুইশানির টাকাটা পেয়েই পয়লা তারিখে বেহালাটা নিয়ে আসবি। মন খারাপ করিসনে!

মোটে বারদিন! আর মাত্র সাতদিন পরেই আকাশে বাতাসে রূপালী আলোর বান ছুটিয়ে স্বপ্নের মায়া বুলিয়ে জেগে উঠবে পূর্ণিমা রাত। বৈজয়ন্তীকে নটরাগিনী বাজিয়ে শোনাব যে! হায় নীল সুরভিত স্বপ্ন! আমি আরো জোরে বেহালার বাক্সটা বগলে চেপে ধরলাম।

—চল্ রে! খেয়ে আসি! উঁচু গলায় আশেপাশের সবাইকে শুনিয়ে সমীর এগোল। চারতালা জীর্ণশীর্ণ বুড়ো বাড়ীটার অন্তরাত্মায় তুমুল আলোড়ন জাগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমরা নীচে নামতে লাগলাম। নয়টি

হতচ্ছাড়া ক্ষুধাক্লিষ্ট নওজোয়ান। নির্ভিক চিন্তাভাবনাশূন্য যৌবনের প্রতিমূর্তি। ভাগ্যবান নিকেতনের হতভাগার দল। সমীর হাঁটতে হাঁটতে আমার কাঁধে হাত রাখল। ওর কানে কানে আবৃত্তি করলাম :

Frind ! Come up to me !
Let me embrace you
And feel the fire in your heart...

আমার কানে ফিসফিস স্বরে বেজে উঠল আমার প্রিয় জেনারেলের প্রেমভরা সুর,

—রবীন ! যেদিন আমি থাকবো না, আমার কথাটা স্মরণ করিস তুই :

Love triumphs where sword fails...

খুব ভোরে বিজয় এসে হাজির। চোখেমুখে খুসীর হাসি উপচে পড়ছে।

—সমীরদা, অনিলদা, দীপেনদা, আপনারা সবাই আজ আমাদের বাড়ী দুপুরে খাবেন।

—কেনরে ! সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে শুধাই আমরা। গতরাত্রে অনেক দেরীতে পেটপুরে খেয়েদেয়ে ফিরেছি। আর এখনি আবার উদার নিমন্ত্রণ ? রাত্রি-শেষের সুখস্বপ্ন নয়তো ?

—আজকে দাদামশাইর মৃত্যুতিথি যে !—বিজয় চোখ গোল করে। ভাসা ভাসা বড় বড় দু'টি চোখ। আজ ভোরের আলোয় বেজায় খুসী মনে হচ্ছে তাকে,—তাছাড়া আমাদের বরাত কী ভাল ! গতরাত্রে বাবা ফিরে এলেন এক শ্রাদ্ধবাড়ী থেকে। ও:, কত জিনিষ পাঠিয়েছেন কী বলবো ! মা বলেছে দিন পনেরো চলবে !

—সত্যি ?

—হ্যাঁ ! আপনাদের কলেজের আগেই রান্না হয়ে যাবে, দিদি বলে দিলে।

কী আনন্দ। আবার পেটপুরে খেতে পাব আজ। তিড়িং লাফ মেরে মাচা থেকে নীচে নামলাম। সাতদিন দাড়ি কামাইনি, প্রথমেই হাঁক ছাড়লাম;

—তপেশ, তোর ক্ষুরটা দেতো দেখি !

শুধু আমার নয়। সবারই শরীরে মনে যেন বিজয় খুসীর ও তৃপ্তির আলো-বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই সকাল বেলা। সবাই এতো ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠল। সরগরম হয়ে উঠল 'ভাগ্যবান নিকেতন'।

সুপ্রভাত। এসো, এসো, সুপ্রভাত। গ্রীষ্মের দুপুরের আগুনঝরা সূর্যের আলোয় আজ বৈজয়ন্তীকে দেখলাম। আবার। দ্বিতীয়বার। অমাবস্যার রাতে যেমন দেখেছিলাম, আজ দুপুরের খরতাপেও তাই দেখলাম। যেন জলছে, সূর্যের মত। পিঠ বেয়ে কোমরে নেমে এসেছে ব্রাহ্মণতনয়ার ঢেউ খেলানো নিবিড় কালোচুলের স্রোত, ছোট্ট সুন্দর একটি ঝাঁকুনি দিয়ে পাশে এলিয়ে পড়া চুলকে পিঠের দিকে ঠেলে হাসল সে,

—পূর্ণিমা কবে খেয়াল আছে তো রবীন দা?

—হুঁ। হাসলাম আমি। খানিক নিঃশব্দে ওর অতলান্ত ছায়াঘন সুনীল চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—কিন্তু বেহালার তার যে ছিঁড়ে গেল হঠাৎ।

—ছিঁড়ে গেল! যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল বৈজয়ন্তী। মুহূর্তের জন্যে তার জলজলে চোখেমুখে একটা কালো ছায়া খেলা করে গেল, তারপর তেমনি আলো ছড়িয়ে হেসে উঠল বৈজয়ন্তী,

—দেখলে তো আমার সোনার ভাগ্যখানা! যেই আমি শুনতে চেয়েছি, অমনি তার ছিঁড়ে গেল।

প্রাণভরে খেলাম। সে যেন কতযুগ আগে এমনি ভালবেসে সেধে খাইয়েছিল কারা আমাদের, এমনি মনে হয়। খাওয়ার পর মুখহাত ধুয়ে ঘরে ঢুকেছি, হঠাৎ আমাকে একা পেয়ে গেল বৈজয়ন্তী। মুখোমুখি দাঁড়াল। চমক লাগল। গভীর ঝকঝকে চোখ, কী সুন্দর নাক, পাতলা রক্তাভ দু'টি ঠোঁট আর ফুলের পাপড়ির মত কমনীয় গাল। চওড়া কপাল যেন উষার পূর্ব-দিগন্ত। আর ঢেউ খেলানো চুলের রাশ। সে যেন যৌবনের দীপ্যমান শিখা। বৈজয়ন্তী হাসল, একরাশ আগুনের ফুলকি যেন ঠিকরে পড়ল মুখে, বললে,

—রবীনদা, বেহালার তার না হয় ছিঁড়েই গেলো, তাই বলে আর দেখতে আসবে না আমাদের? তুমি আবার যে রাগী মানুষ—

—না, না, রাগ কিসের! সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম আমি।—কত কাজ জান না তো!

—কাজ! বিপুল অবজ্ঞায় তার সুন্দর পাতলা দু'টি ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা হুংকার ছাড়ল সে,

—কাজ একথা আর বলোনা আমায়! ওই জানালা দিয়ে তোমাদের

সব দেখতে পাইনা আমি? সবাই যখন কলেজে চলে যায় তুমি জানালার পাশে শুয়ে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করে' কাটাও সারা দুপুর। তোমার আত্মা কাঁদে রবীনদা, আমি শুনতে পাই। কেন এখানে আস না তুমি? তোমার প্রাণ একটুখানি আদর চায়, সহানুভূতি চায়! এখানে সব পাবে। তবে কেন আসনা?

যাদু! ওর কথায় কী যে যাদু রয়েছে!...পাথর হয়ে গেলাম আমি। ব্রাহ্মণনন্দিনী কি সত্যদ্রষ্টা ঋষি? ও কেমন করে' জানতে পেল আমার বুকের ব্যথা, শুনতে পেল আমার আত্মার অবিশ্রাম কান্না—ফুলেফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিবিড় বেদনায় দিনে রাতে কান্না! হঠাৎ আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। উঃ, সে কত পরে, কত অগণন দিন-রজনীর ইতিহাসের পরে! টস্ টস্ করে গাল বেয়ে মেঝেয় পড়তে লাগল আমার চোখের জল।... বৈজয়ন্তী আমার হাত ধরল,

—কষ্ট হলেই তুমি আসবে এখানে রবীনদা! বল আসবে?

ওরা আসছে এবার মুখহাত ধুয়ে। ঘরে ঢুকছে। বৈজয়ন্তী সরে গেল। আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে চোখ মুছলাম। কিন্তু পাথরচাপা প্রস্রবণ আজ মুক্তি পেয়েছে, উথলে উঠেছে আমার অবরুদ্ধ কান্না! কোনমতে ঠেকাতে পারি না। দরদর ধারায় জল ঝরছে চোখ থেকে। হাত ভিজে গেল। আমি জানালার বাইরে মুখ গলিয়ে দুঃসহ রোদে চোখ রাখলাম! দুপুরের খরতাপে পুড়ে যাচ্ছে আমার দু'চোখ। তাই যাক। তবু কান্না নয় আর। আমরা সবাই পথে নামলাম আবার। বৈজয়ন্তী রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। দেখা হয়নি। পথ পুড়ে যাচ্ছে দুঃসহ গ্রীষ্মের খরতাপে। তামাটে আকাশে জ্বলছে প্রচণ্ড সূর্য, নিষ্করুণ হাতে আগুন বিলোচ্ছে অজস্র, মানুষ পশু মাঠঘাট তাকিয়ে আছে কবে রোদ-ঝলসানো আকাশের চোখে উথলে উঠবে অঝোর কান্নার ঢেউ—বর্ষা।

মাসের প্রথমে ছাত্রপড়ানোর টাকা পেয়েই বেহালা নিয়ে এলাম। অনিল, দীপেন, তপেশ, কনক ওরাও ছাত্রপড়ানোর টাকা পেয়ে মেসের মালিকের সঙ্গে রফা করতে গেল সমীরকে নিয়ে। ঠিক হল: খাওয়াটা আমরা বাইরেই সারবো যতদিন বাকি টাকা না দেওয়া যায়। আপাততঃ ঘরভাড়াটাই দেওয়া হচ্ছে।...কিন্তু বৈজয়ন্তীকে বেহালা শুনিয়ে এলাম না কেন? এখনো তো

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠে রাতে! আমি আর ওদিক মাড়াইনি সেই কান্নার পর! জানালার পাশেও বসিনি পাছে সে দেখে ফেলে!

বৈজয়ন্তী! বৈজয়ন্তী!! বৈজয়ন্তী!!! মৌমাছির মত যেন কানে কানে গুন্‌গুন্ করে ফিরছে নামটা। কিছুতে ভুলতে পারি না সেই অতুল রূপ, যে রূপ সূর্যের মত নিষ্করুণ আভায় জ্বলছে। আমার নটরাগিনীর নায়িকা! এ কী হলো আমার? আমি যে ওকে দিনরাতে প্রতিমুহূর্তে চোখের সামনে দেখছি! মনে মনে অবিশ্রাম আলাপ চলেছে ওরি সঙ্গে! ভুলতে পারি না কিছুতেই ও আমার আত্মার কান্না শুনেছে, ওর কুহকীমায়ার কথায় আমার বহুকালের শুকনো চোখে বর্ষা নামিয়েছে!…নিঃসঙ্গ দুপুরে ঘরে একা থাকতে পারব না আমি। ওপাশে থাকে বৈজয়ন্তী!… ঘরে তালা লাগিয়ে দারুণ আগুনঝরা গ্রীষ্মের দুপুরে আমি পথে বেরিয়ে পড়ি। পা পুড়ে যায়। প্রচণ্ড দাহে চোখ জ্বালা করে ওঠে। তবু একা একা বৈজয়ন্তীর চোখের সামনে বসে থাকা নয়। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলব। পাগল হয়ে যাব। আঃ, দুপুরের অসহনীয় উত্তাপে কুকুরের মত আমারো জিভ বেরিয়ে পড়ে, শরীরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। কোথায় যাব আমি! কি করব! শুধু পথে পথে ঘুরি।…আমার এ কী হল! এ আমার কী হল!

এর দিন পাঁচেক পরেই নামল বর্ষা। পথে পথে পাকা আমের বেসাতি। পেট আর পকেট দুইই ফাঁকা। মনও ফাঁকা। বেহালা হাতে তুলিনি কতদিন! নিবিড় বর্ষায় আকাশে আকাশে শান্তি ঘনাল। নিমন্ত্রণ খেয়ে আসার পর থেকে আর বৈজয়ন্তীদের বাড়ী যাইনি। বৈজয়ন্তীকে দেখিনি চোখে। মনে দেখেছি অবিরাম।

সেদিন রবিবার। সবাই'র ছুটি। গতরাত থেকে অবিশ্রান্ত চলেছে বৃষ্টি। বৃষ্টি! বৃষ্টি! আর বৃষ্টি! ঝিমঝিম করছে শরীর ঝমঝম শব্দে। সামনের সরু বারান্দাটা ভেসে যাচ্ছে জলে। সকাল থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরে আলো জেলে বসে আছি নবরত্ন। দুপুরে বৃষ্টির তাণ্ডবে আমরা খাওয়ার সন্ধানে বাইরে যেতে পারিনি। শুধু চা আর পাউরুটি খেয়েছি। আজকাল একবেলা খেয়ে আছি আমরা। রাতে খাই। দিনে শুধু চা। তাই বাতি জেলে বিকেলের ঘনায়মান ছায়ায় মনের স্ফূর্তিতে তাস খেলছিলাম। বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছিল আমাদের তুমুল আনন্দ কলরব। হঠাৎ

দরজায় ধাক্কা পড়ল। দীপেন বললে, 'বাতাস।' কিন্তু আবার, এবার জোরে। সমীর উঠে দরজাটা খুললে।

লাফিয়ে ঘরে ঢুকলো বিজয়, সার্টটা ভিজে চুপসে গেছে। হাঁপাচ্ছে, অথচ হাসছে। দীপেন হাতের তাস সামলে মুখ ফেরাল,

—কি রে, অসুখবিসুখ নাকি আবার? আসব?

—নাতো? তাসের দিকে উঁকি দিয়ে হাসিমুখে দেখল একবার বিজয়। আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বৈজয়ন্তীর মনপোড়ানো ভাস্বর মূর্তি। আমি জানি। আমি জানি! ও কেন এসেছে। সমীর গভীর সোহাগে বিজয়ের ভেজা শরীরটাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল,

—ইস্। আমাদের ছোট্ট ভাইটিকে দৌড়িয়ে মারলে সবাই তাকে ভাল মানুষটি পেয়ে। কিরে এবারেও স্কুলে ফার্স্ট হবি তো? দেখিস, তোর বড় নয়টি দাদা যদি বেঁচে থাকে তবে তোকে ইঞ্জিনীয়ার করে' তবে ছাড়বে। বিলেত আমেরিকা ঘুরিয়ে আনবো। ইস্, আমাদের ছোট্ট ভাইটিরে! সমীর গভীরস্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, তারপর বললে,

—আমাদের দুষ্টু বোনটি কেমন আছেরে? বৈজয়ন্তী? ওর ভাইদের এবার আমকাঁঠাল খাওয়াবে না? সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। বিজয় উঠে দাঁড়ায়, আমার চোখে নির্ভীক হাসি মাখা চোখ দুটি রাখে,

—রবীনদা, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। শীগগির! আমার সঙ্গে এসো!

আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। হাতের তাস দুলিয়ে অসহায় মুখভঙ্গি করে তাকাই আমি ওদের মুখে। সমীর শাসায়,

—ভাখো, তাসের নেশাখোর! যা, যা, তাস ফেলে দৌড়ে যা ওর সঙ্গে। তপেশ খেলবে। ঢ্যাঙ্গা ট্যারা তপেশ শিকারী বেড়ালের মত আমার উপর লাফিয়ে পড়ে' তাস কেড়ে নিল,

—অনেক খেলেছিস তুই—এবার আমায় দে!

সার্ট গায়ে চড়িয়ে বিজয়ের কাঁধে হাত রাখলাম। কী বৃষ্টি! বিজয়ের ছাতার নীচে আমরা দু'জনেই ভিজে চুপসে গেলাম। রাস্তায় হাঁটু জল। দিনান্তের করুণ ম্লানছায়া ঘনাচ্ছে আকাশে। ক্লান্ত নিরেট আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারা নামছে। ভিজতে ভিজতে আমরা জাহাজে এসে ঢুকলাম। ছাতাটা বন্ধ করে এবার শুধাই,

—কে ডেকেছেরে!

—দিদি! বিজয় আমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল,—এবার আমি যাই রবীনদা, দোতলায় শশীদের ঘরে ক্যারম্ খেলছি কিনা! কেমন?... আর অপেক্ষা না করে ভেজা কাপড়েই সিঁড়ি বেয়ে দৌড় লাগাল সে। আমি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। তিনতলার বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়ালাম। একপাটি দরজা বন্ধ, অন্যপাটি আধখোলা, আর তার মাঝখানে মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে বৈজয়ন্তী। বৃষ্টির ধারা খোলা বারান্দায় এসে বিঁধছে আমার ভেজা শরীরে। খেয়াল নেই আমার, দাঁড়িয়েই রইলাম। আমার নটরাগিনীর নায়িকা কোথায় গেল! ওই আকাশের সঙ্গে বুঝি আত্মার যোগাযোগ রয়েছে তার। বর্ষার দিনান্তে বৈজয়ন্তীর শরীরের আগুন নিভে গেছে যেন! কী শান্ত কোমল সবুজ ছায়া ওর চোখেমুখে। অতলান্ত সুনীল চোখে কেমন নিবিড় সুখের আবেশ। রক্তাভ পাতলা ঠোঁটের কোনে একটুখানি হাসি,—স্নিগ্ধ, সুবাসিত। আঃ, কোথায় মিলাল নটরাগিনীর রক্তবর্ণা বীরবসনা রণরঙ্গিনী কৃপাণহস্তা নায়িকার আগ্নেয় রূপ। এ যে হৃদয়হরণ। মনোলোভন। আমি ওর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম—দূরে।

—এসো রবীনদা! তার স্নিগ্ধ সুরভির হাসি বিকশিত হল। যেন রজনীগন্ধা ফুটল।—এসো! সে হেসে দরজার পাটি খুলে সরে দাঁড়াল। আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম। সেই বাক্স-প্যাঁটরা ভর্তি ছোট ঘর। আর কেউ নেই।

—ওঁরা কোথায় বৈজয়ন্তী?—শুকনো সুরে শুধাই।

—বাবার কালীপুজা আছে এক ধনীর বাড়ীতে। মা গেছেন একতলায়। এই আষাঢ়েই বিয়ে হচ্ছে একটি বামুনের মেয়ের। আজ গায়েহলুদ।

—ওঃ! আমি সামনের খোলা জানালা দিয়ে কালো সজল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। স্বপ্ন। মাঝে মাঝেই মনে হয় জীবনটা যেন এক অরতপ্ত প্রকৃতির সৃষ্টি—অবাস্তব অর্থহীন স্বপ্ন। নইলে এমন হয় কেন?

—বসো। এতো মিষ্টি শোনাল তার সুর। যেন বেহালার তারে ছড়ি টানল কেউ। আবার ওই সুস্নিগ্ধ সুরভিত হাসি। সে পণ্ডিতমশাইর বিছানার চাদরটা একটু টেনে দিয়ে তার সেই অনবদ্য ভঙ্গিতে এলিয়ে পড়া চুলের স্রোতকে এক ঝাঁকুনিতে পিঠে ছুঁড়ে ফেলল।

—তুমি একটুখানি বসো রবীনদা! আমি আসছি! আমার হাত ধরে টানল বৈজয়ন্তী,

—ইস্, কত ভিজে গেছো! একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন! ছাতাও নেই একটা? মাথার উপরে কেউ নেই, না? খিলখিল শব্দের তরঙ্গ তুলে হেসে উঠল সে—আমার নটরাগিনীর নায়িকা! বাইরে ঝিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি। মিলিয়ে-যাওয়া স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে প্রাণ আমার কেঁদে উঠছে···

সে সবুজ পর্দা ঠেলে ভিতরে মিশিয়ে গেল যেন। আধমিনিট পরেই ফিরে এসে মেঝেতে জল ছিটিয়ে একটা সুন্দর কাজ করা কাপড়ের আসন বিছালো, সামনে রাখল এক গ্লাস টলটলে জল। হাসলো মিষ্টি করে। আমি সীমাহীন বিস্ময়ে চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কি অপরূপ। সুদুর্লভ রূপ। শান্ত, স্নেহকরুণ। মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে পড়লাম আসনের উপর, খোলা জানালার মুখোমুখি। বৈজয়ন্তী আবার সবুজ পর্দার অন্তরালে মিলালো। ওকি আমাকে ভাইফোঁটা দেবে আজ এই বাদলার নির্জন বিষণ্ণ মুহূর্তে? হে ভগবান, তাই যেন হয়, তাই যেন হয়!···আমার প্রার্থনা শেষ হবার আগেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো বৈজয়ন্তী। সবুজ পাতার ভিড় ঠেলে যেন বনদেবীর আবির্ভাব। আমার সামনে সাদা পাথরের থালা রাখল। ওর কালো চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়ল আনত ঘাড়ের দু'পাশে, মিষ্টি রিনরিনে সুবাস ছড়ালো। আমি বসে আছি থালার সামনে। একরাশ আম—লাল গাঢ়-হলুদ কাটা ফলের চমৎকার সুবাস। সরস আনারসের টুকরো, কয়েকখানি লুচি, একটু ক্ষীর, আর কয়েকটি সন্দেশ। ক্ষুধার্ত নেড়ী কুকুরের মত আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠল লোভে। আজও দুপুরে ভাত খাইনি আমরা। বড় ক্ষুধা!

সামনের বিছানায় বসল বৈজয়ন্তী। বললে,

—বসে কেন রবীনদা? খাও—

—খাব? আমি লোভী অধৈর্য হাতটা গুটিয়ে নিলাম। হতচ্ছাড়া আমি, হতচ্ছাড়া আমি, অলক্ষীর বরপুত্র আমি! আমার ছায়া যেখানে পড়ে সেখানেই দুর্যোগ ঘনায়। শনি! শনি! আমি হাতটা গুটিয়ে কোলে তুলে নিলাম।

—কি হলো রবীনদা? ··· রবীনদা! লক্ষীটি, খেয়ে ফেলো? তোমার কি হয়েছে রবীনদা?

আমি চোখ তুললাম। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখে তাকালাম।

—তুমি সবাইকে ছেড়ে আমায় ডেকে আনলে কেন বৈজয়ন্তী? আমাকে মাত্র দু'দিন তো দেখছো! সমীরকে ভুলে গেলে, দীপেন, তপেশ, কনক, অনিল? ওরা তোমায় কী গভীর স্নেহ করে, শ্রদ্ধা করে। তুমি জানো, সব জানো তুমি, তবে? জানো, ওরা কেউ আজ ভাত খায়নি?

—তা হোক! উঠে দাঁড়াল বৈজয়ন্তী।—তুমি খাও! তোমার জন্যে তৈরী করেছি আমি রবীনদা,—শুধু আজকের দিনটি একা খাও তুমি!

—কেন? শুধু একা আমি কেন? ওরা কেউ নয় কেন?

—তুমি ওদের কেউ নয় বলে, তাও বুঝতে পার না? তাও বলে দিতে হবে? বিদ্রোহে ঝলসে উঠল বৈজয়ন্তী!—তোমার বেহালা শুনলাম না, কিন্তু বুকের কান্না তো লুকিয়ে রাখতে পারলে না, রবীনদা!...হঠাৎ তার গলা বুজে এলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালায় নিথর ভঙ্গীতে মাথা ঠেকিয়ে বাইরের ভেজা ছায়াকালো আকাশের পানে তাকাল সে। ... পশ্চিম দিগন্তে এবার মেঘ হালকা হয়ে গেছে, স্নিগ্ধ গোলাপী আলো ছড়িয়ে পড়েছে দিনান্তের কনেদেখা-আলো সেই ন ম কুহেলীর আলোয় আমি ওকে দেখতে লাগলাম প্রাণভরে, সকল ইন্দ্রিয়কে দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত করে মন্ত্রমুগ্ধের মত। নিথর নিস্পন্দ প্রতিমা, শুধু ঝড়ো বাতাসে একরাশ কালোচুল উড়ে পড়ছে দু'পাশে। নিঃশব্দে খাবারের সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ও পিছন ফিরে তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে। গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম একটিবার, বাইরে পা ফেললাম চুপিচুপি। তারপর নিঃসাড়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে 'ভাগ্যবান নিকেতনে' ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতেই অনিল চোখ তুলে তাকাল,

—এঃ, ভিজে গেছিস দেখি একেবারে। কে ডেকেছিল রে! সে তাস বিলিয়ে দিতে দিতে বললে।

—বৈজয়ন্তী। আমি এগিয়ে গিয়ে মাচা থেকে বেহালার বাক্সটা তুলে নিলাম।

—ওঃ! সমীর একগোছা তাস হাতে তুলল।—আঃ, বৃষ্টিটা ধরে এসেছে এবার। কেন ডেকেছিল রে বৈজয়ন্তী? আমার দিদিটিকে দেখিনি ক'দিন—

—খেতে ডেকেছিল! আমি ওদের দিকে না তাকিয়ে গলার সুর না বদলে বলে উঠি, ট্রাংকের আড়াল থেকে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা টেনে বের করি।

—বিরাট ব্যাপার। থালা ভর্তি আম, সন্দেশ, ফল—আর,... আমি দেয়ালে

ঝুলানো সার্ট ও প্যান্ট ধরে টান দিই এবার। ওরা আটজন তাস থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে বিস্ময়ে বিভ্রান্তিতে চোখ গোল করে। আমি কোনো দিকে নজর না দিয়ে ব্যস্ত হাত চালাই।

—চমৎকার! সমীর জিভ দিয়ে আফশোষের শব্দ করল।

—খেলি নিশ্চয়! আহা—

—উহুঁ।—আমি সার্টটা দলা পাকিয়ে ব্যাগে পুরলাম।

—খাসনি?—সমীর বিস্ময়াহত দুই চোখ তুলে তাকায় তাস ছুঁড়ে ফেলে,

—রবীন! খুলে বল্ দেখি! তোর রকমসকম জানি আমি, বৈজয়ন্তী কিছু অন্যায় বলেছে?

—না, না!—আমি ব্যাগটা হ্যাঁচকা টান মেরে দরজার কাছে ছুঁড়ে ফেললাম।

—ওরা অন্যায় করবে কেন? পাপ আমি, অলক্ষী আমি, সমীর! হতভাগা আমি! তাইতো তোদের বোন বৈজয়ন্তী সহজভাবে আমায় ভাই বলে মেনে নিতে পারল না। আমার ছায়া যেখানে পড়ে সেখানেই যেন সূর্য রাহুগ্রস্ত দূষিত হয়ে যায়। তোরা বৈজয়ন্তীকে ভুল বুঝিসনে! তোদের ভিতর যে পবিত্র মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অক্ষয় হোক, এ আমি নষ্ট হতে দেব না। কিছু শুধাস না আমাকে, শুধু জেনে রাখ, বৈজয়ন্তী, আমাকে ভালবাসতে চায়, আর আমি—

বেহালার বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওরা উদভ্রান্ত অবুঝ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা আটজন। বৈজয়ন্তীর আট ভাই। হতভাগা আমি ছিলাম অতিরিক্ত, অপয়া, অবাঞ্ছিত আগন্তুক। রাহু। আমি যে ওদের কেউ নই,—সে বলেছে! সে বলেছে—

সমীর এতক্ষণে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, শিরদাঁড়া সোজা করে মাথা তুলে হাসল,

—মানে, তুই চলে যেতে চাস্!

—হ্যাঁ, আর পরিচিতের মাঝে নয়! খাপ খাচ্ছে না। শুধু গণ্ডগোল, পাথুরে কলকাতার মহানগরী যেন চাইছে না আমাকে। দে সমীর, কয়েকটা টাকা দে—

—তুই যেতে চাইলে তোকে আটকাবার অধিকার কার আছে রে! সমীর করুণ হাসি হাসল।—যেখানে শান্তি পাবি সেখানে যা।

একটা কাগজে ছোট্ট একটি চিঠি লিখে সমীরের হাতে দিলাম।

—কালকে এই চিঠিটা নিয়ে যাস আমার ছাত্রের বাড়ীতে। তোকে চেনেন ভদ্রলোক, টাকাটা নিয়ে নিস। চ্যালো, গুড্‌বাই এভরিবডি!

সমীর কয়েকটি টাকা আমার পকেটে গুঁজে দিল। ওদের রাত্রের ভাত খাওয়ার টাকা।—Au revior, রবীন! যদি ফিরে আসিস কোনদিন, আমাকে হয়তো সেদিন দেখতে পাবিনারে, কিন্তু এ ঘর তোর জন্যে খোলা থাকবে—

—জানি সমীর, জানি! আমি ব্যাগটা হাতে নিলাম।—একটা অনুরোধ, বৈজয়ন্তীকে ভুল বুঝিস নে তোরা। আমি ওকে অন্তরের পুজো দিয়ে যাব শেষদিন পর্যন্ত—বিদায়। গুড্‌বাই এভরিবডি!

ওরা কেউ বাধা দিলেনা। 'ভাগ্যবান নিকেতনের ভাগ্যবান'রা কারো ইচ্ছায় বাধা দেয় না কখনো। আর আমাকেও চেনে সবাই। একে একে আমার চোখে চোখ রেখে তারা বিচিত্র সকরুণ হাসি হাসল। আমি নীচে নামলাম! হঠাৎ থেমে গেছে বৃষ্টি। শুধু কালো আকাশ থেকে টুপটাপ পড়ছে দু'এক ফোঁটা। কী ক্ষুধা! ওই যে বৈজয়ন্তীদের ঘরে আলো জলে উঠছে। রাস্তা জলেকাদায় একাকার, গ্যাসের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। উপরে তাকালাম। 'ভাগ্যবান নিকেতনে'র তিনতলার আলোভরা জানালায় আটখানি বেদনাবিধুর বিভ্রান্ত মুখ উদগ্র আগ্রহে নীচে তাকিকে খুঁজছে আমাকে। হাত নাড়লাম আমি।

—গুড্‌ লাক্‌ রবীন! গুড্‌বাই, গুড্‌বাই, গুড্‌—বা-ই—

—গুড্‌ নাইট! গুড্‌ নাইট ফ্রেণ্ডস্‌! লাক্‌! আমি কাদায় পা ফেলে টলতে টলতে এগোই। কানে বেজে উঠে শুধু:

Friend! Come up to me........
Let me embrace you
And feel the fire in your heart......

সেই রাত্রেই ট্রেনে চাপলাম। থার্ডক্লাস কামরার বাঙ্কে লুটিয়ে পড়তেই গভীর ঘুম আচ্ছন্ন করে ফেলল আমায়। সেই ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল বেলা। বড় জংশন, স্টেশনে গাড়ী থেমেছে। নীচে নেমে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে স্টেশনের নাম পড়লাম। পরিচিত নাম। গঙ্গা আছে এখানে।

আমার টিকিট আরো দূরের। এক মুহূর্ত ভাবলাম, তারপর প্লাটফর্মে লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

২

গঙ্গার তীরে একটি শহর। স্টেশনে টাঙ্গাওয়ালারা হেঁকে ধরল। ওদের আক্রমণ ঠেকিয়ে কিছুদূর এগোতেই এলো আরেকজন,—খাড়াখাড়া চুল, ফোলা নাক, গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারার একজন—অনবরত ছোট্ট দুটি চোখ পিট পিট করছে।

—বাবু হোটেলে যাবেন? খাবেন ভাল, ঘুমুবেন খুব, সস্তা রেট!

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে বেহালার বাক্সটা বগলদাবা করে পথে নামলাম। মেঘ কেটে যেতে শুরু করেছে এতক্ষণে, মাঝে মাঝে মেঘভাঙ্গা সূর্যের আলো পথের কাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাস্তার পাশের গাছে পাখির আনন্দ-কলরব। ভাল! ভাল! সব ভাল! খুশির জোয়ার জেগে উঠল মনে।

আমি উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে লাগলাম। বাজার ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। এবার দু'ধারে সুদূরপ্রসারী আমের বাগান, মাঝে মাঝে বড় লোকদের বাগানবাড়ী, আর গরীবদের কুশ্রী ঘরের সারি। মস্ত মস্ত কালো-মুখ হনুমান তিনহাত লম্বা লেজ দুলিয়ে বাড়ীর ছাদে বসে ফলমূল চিবোচ্ছে মুখ খিঁচিয়ে। তাও পেরিয়ে গেলাম। এবার দু'ধারে শুধু মাঠ। সবুজ ঘাসের গালিচাপাতা বিস্তীর্ণ মাঠ। তার মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুরূপসী সরকারী দপ্তরখানা। তারপর উঁচুনীচু পথের দুপাশে আবার অফুরন্ত সাজানো আমবাগান। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার তীরে বালির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। ওপার থেকে রেলপথের যাত্রীবাহী ফেরী-ষ্টীমার এসে দাঁড়াল ঘাটে; পিলপিল করে লোকজন ছুটে আসছে তীরের দিকে। টাঙ্গায় চেপে তারা শহরে চলল।

এবার মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের সুনীল ঐশ্বর্য আত্মবিকাশ করেছে প্রচণ্ড দীপ্তিতে। আষাঢ়ের সূর্যের দাহনে যেন অকস্মাৎ সুপ্ত ক্ষুধার রাক্ষস হুঙ্কার দিয়ে জেগে উঠল এবার। আমার দুর্বল মাথা ঝিম ঝিম করে' উঠল। যেন আর দাঁড়াতে পারছি না। ক্ষুধা! মনে হল, আজন্ম আমার আর কোন অসুখ নেই, শত্রু নেই, কোন ভয় নেই—শুধু দুর্দমনীয় ক্ষুধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত। আর পারলাম না। ধপ্ করে গরম বালির ওপর বসে' পড়লাম। এই নীল আকাশের মত মহাশূন্যতা যেন ভয়াল ক্ষুধা নিয়ে

আমার ভিতরে হাহাকার করে ফিরছে। বড় ক্ষুধার্ত আমি। একটি টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এল।

—শহরে যাবেন বাবু?

সব যাত্রী চলে' গেছে। শুধু দু'জন একটা টাঙ্গায় উঠে অন্য সরিকের প্রত্যাশায় আছে। পকেটে হাত দিলাম। দুটো টাকা আছে। উঠে বসলাম গাড়ীতে। হেলে দুলে গাড়ী চলল। অতি নির্জীব হতভাগা একটি ঘোড়া। লাল চামড়া ঠেলে তার হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে। পিঠে ঘা। মাথা নুইয়ে বেচারী চলছে, পিঠে পড়ছে বেত। চারজন মানুষ আর মালপত্র নিয়ে এই গরমে ভাঙ্গাচোরা রাস্তায় বেচারী অজস্র ক্ষুধা নিয়ে ছুটে চলল। সেই ক্ষুধার্ত আধমরা ঘোড়াটি আমার ক্ষুধার্ত শরীরটাকে টেনে এনে শহরের মাঝখানে ছেড়ে দিল। একটা হোটেলের সন্ধানে দু'পাশে তাকিয়ে পথ চলতে লাগলাম। এখুনি খেতে হবে আমাকে। নইলে ক্ষুধার রাক্ষসের নখের আঘাতে হয়তো সব ভুলে এখনি পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠব আমি। নিরালা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাই। প্রায় দুপুর। রাস্তায় লোক জনের ভিড় নেই। নিষ্ঠুর দুপুরের সূর্য মাথায় আগুনের বোঝা চাপিয়ে চলেছে অবিরাম। এমনি যখন অবস্থা হঠাৎ দেখি স্টেশনে-দেখা সেই হোটেলের গোলগাল লোকটি, রাস্তার কিনারে মস্ত একটি বাড়ীর আল্‌সেয় বেঞ্চের উপর বসে বিড়ি ফুকছে, তাকাচ্ছে চোখ পিটপিট করে। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল,

—আসুন, আসুন, এই যে অজন্তা হোটেল, খাবেন ভাল, ঘুমোবেন চমৎকার, সস্তা রেট—

হোটেল! ঝিমানো দৃষ্টি তুলে তাকালাম। মস্ত সাদা তিনতলা বাড়ী। দোতালার বারান্দায় বোর্ড ঝুলছে, "অজন্তা হোটেল"। আর অপেক্ষা নয়, হেসে ওর দিকে এগোলাম।

—আসুন, আসুন। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকলো। তারপর মিনিট কুড়ি ধরে সে কি স্বর্গসুখ! বাছুরগেলা অজগরের মত নির্জীব হয়ে চেয়ারে পড়ে রইলাম আমি। পাশে বসে গোলগাল লোকটি অনর্গল বকে চলেছে। সে ভদ্রলোকের ছেলে। হোটেলে যাত্রী ডেকে আনাই তার কাজ। হোটেলেই খায়, ছোট্ট ঘরে ঘুমায়। নাম তার রাজেন।

—আপনি হোটেলে থাকবেন তো বাবু? সে বেহালার বাক্সটা নাড়াচাড়া করে এবার। অবাক চোখে আমাকে দেখে।

—উহুঁ। আমি আধশোয়া ভঙ্গিতেই মাথা নাড়ি। ··· আর মাত্র চার আনা সম্বল—

—মোটে! তাইতো। লোকটা বেহালার বাক্সটা কোলে তুলে নেয়।

—এইটা আপনি বাজান? বাব্বারে, গুণীলোক! জানেন, এই হোটেলের মালিক, নামটা তার ভুলে গেছি, সবাই ডাকে ডাক্তার সাহেব, তিনি গুণীলোকদের খুব ভালবাসেন। অদ্ভুত লোক, যদি ওকে ভোলাতে পারেন, তবে বুঝছেন তো! গোল গালফোলা ফোলা নাক, খাড়া খাড়া চুল, শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে কেমন একটা ঘিনঘিনে ভাব জাগে। এরপর ধীরে ধীরে ভাল লেগে যায়। সে চালাক ছেলে, বুঝে নিয়েছে আমার অবস্থা। আমিও ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। ভালবেসে ফেলেছি শহরটাকে। সাগ্রহে রাজেনের হাতটা ধরে ফেললাম,

—কোথায় ওঁকে পেতে পারি বল তো?

সেই মুহূর্তেই আমি আর রাজেন বন্ধু হয়ে পড়লাম। সে আমায় তার ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল। বিছানার ওপর বসলাম দু'জনে। শিয়রের কাছে জ্যোতিষতত্ত্বের বই একগাদা। দেয়ালে রঙীন হনুমানের ফটো; তার পাশেই এক সুন্দরীর লালসাতুর ছবি। সে বকে চলল। ··· মা বাবা নেই, ছোটবেলা থেকে পরের ঘরে মানুষ। পড়াশুনা করতে পারেনি। জ্যোতিষ শিখেছিল নিজের চেষ্টায়। গুণীমানুষ দেখে ডাক্তার সাহেব আশ্রয় দিয়েছেন। আর ডাক্তার সাহেব? বড় আশ্চর্য মানুষ। তিনি সত্যি ডাক্তার কিনা কেউ বলতে পারে না। কোনকালে ওষুধ বা অসুখ নিয়ে কথা বলতে শোনেনি তাকে কেউ। তবু সবাই ডাকে ডাক্তার সাহেব। বছর ছয় আগে হঠাৎ কোথা থেকে এই শহরে এসে হাজির। মস্ত বড় বাড়ী তুললেন, হোটেল খুললেন। কাছেই বাগানওয়ালা ছোট্ট দোতলা বাড়ীতে থাকেন তিনি। স্ত্রী সারাবছর শুয়ে থাকেন দোতলার বিছানায়, বাতে বাঁদিক অসাড়। তাঁর আট মেয়ে। রাজেশ নাম দিয়েছে সঙ্গীতের পরিভাষায়: সা রে গা মা পা ধা নি সা। এই নামকরণের কারণ—সবাই নাকি গান বাজনায় পারদর্শিনী। এদের মধ্যে প্রথম চারজনের বিয়ে হয়েছে। পঞ্চম কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছে। ছয়-সাত-আট পড়াশোনা গান বাজনা নিয়ে থাকে।

এরপর ঘণ্টা দুই ধরে রাজেন আমার হাতের রেখা নিয়ে ডুবে রইল। অনড় বসে বসে আমি শুধু তার চোখ পিট পিট করা ভঙ্গি দেখে যেতে লাগলাম। এমনি করে' বিকেলের ছায়া ঘনালো, দূরের সিনেমাবাড়ীর ছাদের আড়ালে সূর্য চলে পড়ল। রাজেন বাইরে থেকে খবর আনলো—ডাক্তার সাহেব এসেছেন। সে আমার কথা বলে এসেছে তাঁকে। ... রাজেন কিন্তু আবার বাইরে গেল এবং মিনিট দশ পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরলো। সে বেচারীর চোখ জনায়উত্তে দ্রুত পিট পিট করছে এবার। চাপা গলায় বলে উঠল,

—যাও এবার, তোমাকে ডাকছেন! হ্যাঁ, বেহালার বাক্সটা কাঁদা করে বগলদাবা করে ঘরে ঢুকবে—এমনি!

রাজেনের নির্দেশমত কায়দা করে বেহালা বগলদাবা করলাম। বারান্দার পশ্চিমপ্রান্তে অফিস ঘরে বসে' আছেন ডাক্তার সাহেব। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। গমগমে ভারী গলার আওয়াজ যেন মাইকের ভিতর দিয়ে বের হচ্ছে। প্রতিটী কথাকে যেন পরখ করে চিবিয়ে চিবিয়ে বাতাসে ছুঁড়ে দিচ্ছেন ডাক্তার সাহেব। আমার পা চলতে চায় না যেন।

—সিঙ্গাপুরে যখন ছিলাম! ...তিনি সেই অদ্ভুত গমগমে গলায় কার সঙ্গে কথা বলছেন। রাজেন ধাক্কা লাগাল আমার পিঠে। চাপা গর্জন ছাড়ল,

—ঢুকে পড়ো!

—উনি কথা বলছেন যে! আমি আপত্তি জানালাম।

—কথা আর থামবে না, আমি বলছি ঢুকে পড়ো তুমি! ...রাজেনের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমি প্রায় হুড়মুড়িয়ে পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কাউন্টারের ওপাশে কেরানিটি মাথা নুইয়ে কাজ করছে, ওর মাথার ওপর দেয়ালে মস্ত এক বাঁধানো ফটো; নিবিড় জঙ্গলে বন্দুক তুলে বাঘ শিকার করছেন এক দুর্ধর্ষ শিকারী। আমার সামনে মস্ত সোফায় গা এলিয়ে বসেছেন একজন: ষাটের ওপর বয়েস, মুখে সাদাকালো মেশানো চাপ দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল। টকটকে লালচে রঙ, চওড়া কপাল, খড়্গ-নাসা, আর গভীর মর্মভেদী দৃষ্টিভরা দুই নীলাভ চোখ। গায়ে গলাবন্ধ কোট, পরণে পাজামা। নিশ্চয় ডাক্তার সাহেব উনি, মর্মভেদী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছেন আমাকে। আরেক সোফায় বসে আছেন সাহেবী সাজ পরা সৌখীন এক ভদ্রলোক। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। নমস্কার করলাম।

—ইয়ংম্যান, ইউ নীড মাই হেল্প.? পাতলা ঠোঁট দুটি ফাঁক হল একটু।

সেই গমগমে বজ্রগম্ভীর আওয়াজ। আমি তাকিয়ে রইলাম নীরবে অনড় বেহালা বগলে নিয়ে। কণ্ঠস্বরের কী প্রচণ্ড সম্মোহনী শক্তি! ডাক্তার সাহেব তার আলাধরা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকিয়ে বলে যেতে লাগলেন,

—ইয়েস, ইউ লুক অনেস্ট! ইয়ংম্যান, আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু কয়েক হাজার বছরের পুরোণো সব বাজে কুসংস্কার আর ঘৃণ্য গোঁড়ামী সমূলে ছেঁটে ফেলেছি। নতুন সমাজের পত্তন করছি আমরা। তোমার প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে অন্যায় প্রশ্ন করবো না তোমাকে। অন্‌লি ওয়ান্ থিং; তুমি কি ফেরারী আসামী? তুমি কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছো? আমাকে বিপদে ফেলবে?

আমার মুখ ফুটে কোন শব্দ বেরোল না। অভিভূত হয়ে গেছি আমি। একেই বলে ব্যক্তিত্ব। যেন একটি বিরাট চুম্বক, তার সামনে আমি ছোট লোহার মেসিন যেন চুম্বকার্ষণে হঠাৎ বিকল হয়ে পড়েছি। ওর দৃপ্ত দেহভঙ্গি আর বজ্রগম্ভীর কথার সামনে মুখ খুলে চপল হবে এমন সাধ্য কার! বিদ্যুৎ-ভরা বজ্রের সঙ্গে রসিকতা চলে না, চপলতা চলে না। শুধু মাথা নাড়লাম।

—আমি ···

—দ্যাট্স ফাইন্! তেমনি আমার চোখে তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থির রেখে মাথা নাড়লেন তিনি। —বেহালা কেমন বাজাও তুমি? উহুঁ, তোমার নিজের মতামত বলে যাও! বি ফ্র্যাঙ্ক! বি ফ্র্যাঙ্ক!

—সাধনা করে গেলে একদিন সফল হবো, এই আমার বিশ্বাস। এতক্ষণে মুখ খুললাম আমি।

—ফাইন্! কথাটা যেন মনে ধরল ডাক্তার সাহেবের। —আরে, বসো, বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমাদের বর্তমান যুগের মানুষের মারাত্মক দোষ কি জান? আমরা ফ্র্যাঙ্ক হতে জানিনে—ফলে ভণ্ড হতে পারি সহজেই। বাপের সামনে সিগারেট খাইনে অথচ আড়ালে পিতৃনিন্দা চলেছে অবিরাম। সবক্ষেত্রেই এ'রকম। ইয়ংম্যান, তুমি আমার কাছে ফ্র্যাঙ্ক হবে এই আমি চাই, বুঝলে?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ—অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সার্চলাইটের মতন। বুক কাঁপানো গমগমে কণ্ঠস্বর—আর ক্ষুরধার কথা। পরখ করে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ। অনন্য পুরুষ ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার সাহেব আবার একটা লম্বা চুরুট ধরালেন। আমি আরেকটি

সোফায় বসে পড়লাম। স্যুটপরা সাহেবটি যেন বিরক্তভাবে একবার সোফায় নড়ে চড়ে বসলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে থমথমে মুখে ডাক্তার সাহেব বললেন,

—আই লাইক ইউ ইয়ংম্যান! কিন্তু মনে রেখো, যে মুহূর্তে দেখবো তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে চলছো, আমি কেটে পড়বো। হ্যাঁ, ভাল কথা। আমার আট মেয়ে। সব কটিই গানে বাজনায় এক্সপার্ট। শুধু ছোট মেয়েটি; আমার নমু-মা,—ওর হার্ট বড্ড দুর্বল, চেঁচাতে পারবে না ও। ওকে নিয়েই ভাবনা ছিল। যাক্, মিটে গেল। তুমি বেহালা শিখাও ওকে। কাল থেকেই শুরু করে দাও। শিখিয়ে তৃপ্তি পাবে আমার নমু-মাকে—এইটুকু বলতে পারি।

আমি নীরবে বসে রইলাম। সেই আশ্চর্য লোকটার সামনে অবাস্তর কথা বলা যেন অপরাধ মনে হয়। সেই ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত নীলাভ দুইচোখের মর্ম-সন্ধানী দৃষ্টি শূন্যে মেলে তিনি চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন নীরবে। আমরা নিথর বসে। আমি, সাহেবী লোকটা আর কাউণ্টারের ওপাশের কেরানী। যেন স্বপ্ন দেখছেন ডাক্তার সাহেব। দিগন্ত পেরিয়ে কোন নির্জন গহন পর্বতমালার সুউচ্চ বনানীর নিবিড় স্বপ্ন। হঠাৎ যেন তন্দ্রা ছুটে গেল। সেই ভারী দুর্লভ কণ্ঠস্বরে আবার ঘরের বাতাস অনুরণিত হয়ে উঠল। আবার আমার চোখে-মুখে জ্বলন্ত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির খোঁচা অনুভব করলাম।

—রাজেন বলেছে তোমার কথা। হি ইজ এ গুড্ ম্যান্। শুধু আমাকে নিয়ে আড়ালে একটু হাসাহাসি করে, এই আর কি। তোমার বাড়ী আসামে, না?

আমি মাথা নাড়লাম।

—আসামের পাহাড়! সিম্পলী ওয়াণ্ডারফুল! অকস্মাৎ সেই টানা টানা চোখে নিবিড় আষাঢ়ের মেঘের মত কালো শান্ত ছায়া ঘনিয়ে এলো। স্বপ্ন নেমে এলো নীলাভ চোখে। যেন কোন সুমধুর অতীতস্মৃতির অতলে ডুব দিলেন ডাক্তার সাহেব। আত্মগতভাবে যেন নিজেকেই বলে যেতে লাগলেন শূন্যে তাকিয়ে ধীর নিরুত্তাপ সুরে,—যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে তুমি দেখবে সামনে সবুজপাতার তরঙ্গ এঁকেবেঁকে কতদূর চলে গেছে, গিয়ে মিশেছে নীলপাহাড়ের সারিতে। সেখানেও তরঙ্গ, একটার গায়ে আরেকটা নীলপাহাড় চলে গেছে কতদূরে। দৃষ্টি ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। আর কী

মিষ্টি বাতাসের শীষ। বুনো ফুলের মেলা। আর সেই মানুষগুলো। পুরুষদের শরীরে লোহার মত শক্ত গোল গোল পেশী। মনে মৃত্যুভয়হীন দুর্জয় সাহস। আর মেয়েদের সে কী উগ্র রূপ। ওয়াইল্ড ইয়ুথ, মাই ইয়ংম্যান্! সেভেজ বিউটী! প্রায় গোটা এশিয়া ঘুরে এলাম, আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে যে বিচিত্র যৌবনের লীলা দেখলাম, —ওঃ, ইট মেক্স্ মি ফিল ম্যাড, দি ভেরী থট ইনটক্সিকেট্স্ মি! ওয়াইল্ড লাইফ! গ্লোরিয়াস ইয়ুথ! শুধু সবুজ, শুধু নীল, আর মিউজিক্যাল ঝর্ণার আনন্দ। হাজার রকমের অর্কিড বন আলো করে' আছে। উঁচু পাহাড়ে ছায়াঘন বন ঠেলে এগোবে তুমি একা একা, যেখানে কোনদিন জীবিত মানুষের পা পড়েনি, সেখানে এসে দাঁড়াবে তুমি। বুকভরে সবুজ পাহাড়ের অর্কিডের সুবাসমাখা বাতাস টেনে নেবে। থ্রিলিং! হঠাৎ আসবে বুনো হাতির পাল, দশটা, পঁচিশটা, পঞ্চাশটা, একশোটা। উত্তেজনায় বুক লাফাবে তোমার, ওদের পথ ছেড়ে দিয়ে ঝোপের ভিতর লুকোবে তুমি। বনময় আলোড়ন জাগিয়ে ওরা চলে যাবে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখবে মাথার উপরেই আকাশছোঁয়া গাছের ডালে ঝুলছে ত্রিশফুট লম্বা ময়াল কি অজগর সাপ। কী রঙের ছটা, রূপের বাহার! তুমি এগোবে। পাখীর দল বনে বনে গান গাইবে। সন্ধ্যার আবছায়ায় স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক বুক শান্তি নিয়ে তুমি ফিরবে পাহাড়ী বস্তিতে। ঢোল বাজিয়ে পুরুষরা গান গাইবে। শক্ত সমর্থ নির্ভীক মানুষের দল। দুনিয়ার কোন কূটনীতি আর ভণ্ডামির কণামাত্র জ্ঞান যাদের নেই। সরল, বিশ্বাসী, সহজ মানুষের দল। আর মেয়েরা! ওই পাহাড়ী প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাদের দেহমনে দুর্দম উচ্ছসিত বাঁধভাঙা সবুজ যৌবনের বাহার। স্বল্প আবরণ। টকটকে রঙ। মিষ্টি হাসি। আগুনের কুণ্ড ছেড়ে বস্তির গাঁওবুড়া এগিয়ে এসে আমন্ত্রণ জানাবে তোমাকে, মুখে ধরবে মদের ভাণ্ড। তোমাকে খেতে হবে, নাচতে হবে ওদের সুরে সুর মিলিয়ে। অকল্পনীয় সৌন্দর্যের স্বপ্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে জাগবে নীলআকাশের চাঁদ। তোমার মনে হবে এতদিনে জীবন সার্থক হলো পৃথিবীর মহিমময় রূপ দেখে! ... হঠাৎ যেন নীল স্বপ্নের চূড়া থেকে চমকে নেমে এলেন ডাক্তার সাহেব, সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন,

—এ্যাণ্ড আই এ্যাম আফটার সামথিং, ইয়ংম্যান্! তোমরা বলো তুষার-মানব! স্নো-ম্যান্! ফুঃ, ওরা আছে হিমালয়ে, আই নো, আই

নো, আই বিলিভ! ওরা আছে! দেখবে আমিই ওদের খুঁজে বার করবো একদিন! এখন এটা একটা সিক্রেট্!...

স্তব্ধ নিঝুম হয়ে বসে থাকি আমরা তিনজন। আমি, সাহেবী লোকটি আর কাউন্টারের ওপাশে রোগাটে বুড়ো কেরানি। বিকেলের ম্লান গোলাপী আলো নীল পর্দা ঠেলে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। নিবে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে গম্ গম্ স্বরে কথা বললেন আবার ডাক্তার সাহেব, তারপর বিপুল দৈর্ঘ্য নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন,

—আপাততঃ রাজেনের সঙ্গেই থাকবে তুমি। কোন অসুবিধা হলেই জানাবে। সবাই ফ্র্যাঙ্ক হোক এই আমি চাই। আর কাল বিকেলে রাজেন তোমায় আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবে! দ্যাট্স্ ফাইন্!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। নীরবে নমস্কার করে বেহালার বাক্স সামলে পা বাড়ালাম। আমার পিছনেই সেই অস্বাভাবিক নিরেট কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো,

—হ্যাঁ, কী বলছিলাম, মিঃ সেন? ইয়েস, কত মাংসই তো খেলাম, কিন্তু সেই সিঙ্গাপুরের হোটেলে যে দিন ক্রোকোডাইলের মাংস খেলাম, ওঃ গড্—

রাজেনের ঘরে ঢুকে দেখি সে জ্যোতিষের পুঁথিপত্র খুলে ঝুঁকে পড়েছে বিছানার উপর। আমার দিকে তাকিয়েই দেখল না। আমি ধপ্ করে ওর পাশে বসে পড়লাম, ওর পিঠে হাত রাখলাম,

—সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু একটু কেমন অদ্ভুত মনে হল ওঁর ধরণ-ধারণ। ক্রোকোডাইলের মাংসের চপ খেয়েছেন বলে লাফাচ্ছেন দেখে এলাম!

—হুঁ। মাথা না তুলেই পেন্সিল দিয়ে কী সব আঁকিঝুঁকি আঁকতে লাগল রাজেন। —ওটা ওঁর একটা প্রিয় গল্প। নতুন মানুষ পেলেই শোনান্!

—কিন্তু কেন যে এসব বলেন তিনি! আমার স্বরে ওর জন্যে দরদ ঝরে পড়ল,—লোকে হাসে, তাও কি বোঝেন না?

—বাঃ, তিনি এসব বলবেন, এত স্বাভাবিক, এঁ্যা? তাকে যে একথা বলতেই হবে! রাজেন এতক্ষণে মুখ তুলে অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল।

—ওর হাতে যে হেড-লাইন নেই!

—মানে? আমি বিস্ময় গোলচোখে ওর দিকে চেয়ে থাকি।

—মানে হাতের রেখা। ওর হাতে মস্তিষ্করেখা নেই কিনা! রাজেন সস্নেহে হাসে। ফোলা ফোলা নাকটা যেন খুশীতে আরো ভরে ফুলে ওঠে। —উদি

একটি মহৎ পাগল, তাও বুঝলেনা এতক্ষণে? নইলে তোমার আমার মত অপদার্থকে বিনিপয়সায়, হেঁ-হেঁ-হেঁ,—ওর তুষার মানব আবিষ্কারের গল্প করেন নি? রাজেনের পিটপিটে চোখে ধূর্ত-দৃষ্টি ঘনিয়ে আসে, বিশ্রীভাবে হাসতে থাকে সে; জোর করে আমার হাতটা টেনে নেয়, খুঁটিয়ে দেখে:

—হুঁ। হেড লাইন ঠিক আছে। তবে প্রেমঘটিত ব্যাপারে ভুগবে হে ছোকরা, হার্টলাইন বড় গোলমেলে। এর ওপর আবার গার্ডল অব ভেনাস্। শুক্রস্থানও অতিরিক্ত পুষ্ট। চন্দ্রস্থানে এই লাইনটা দেখেছো! আবার তেমনি বিশ্রীভাবে হাসে ত্রিশবছরের গোলগাল অপদার্থ লোকটা, কুতকুতে চোখদুটো জোনাকির মত পিটপিট করতে থাকে অনবরত, লাল জিভটা আহ্লাদে বেরিয়ে পড়ে। —যে মেয়েকে ছাত্রী পেয়েছো, দেখো মজে না যাও। অবিশ্যি এর আগেই শ্রীমতী 'পা' যদি কলকাতা থেকে এসে পড়েন; তবে উনিই আমায় দেখবেন। আমার আর হলো-নারে ভাই, এই দেখো হৃদয়রেখা দুমড়ে গেছে। প্রেমে বিফলতা, মানে—বিশ্বাস করো রবীন, আমি এখন ঘোরতর নারী-বিদ্বেষী। এ রিয়েল মিজোগাইনিষ্ট! ··· হ্যাচকা টানে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

—ছিঃ, থাক ওসব কথা। তোমার ট্রেনের সময় হল···

—মাই গড। লাফিয়ে নীচে নামল সে। —তাইতো, ইষ্টিশানে ছুটতে হবে এবার, ভাল যাত্রী দু'একজন ডেকে আনতে হবে। সকালে যাকে আনলাম সেতো, হি হি হি, ···রাজেন অসভ্যের মতো হাসে, লাল জিভটা ভিতরে বাইরে লাফাতে শুরু করে। তারপর চটি জুতা ফট্ ফট্ করতে করতে বাইরে চলে যায় সে, —ব্রাদার, রাগ করোনা। রাজেন চৌধুরীর দোষের মধ্যে ওই এক, স্পষ্ট বক্তা···

বারান্দার সুদূর প্রান্ত থেকে প্রাণবন্ত আশ্চর্য পুরুষ ডাক্তার সাহেবের ঐশ্বর্যবান গমগমে গলার অট্টহাসি ভেসে এলো। ···হা-হা—হা-হা, ক্রোকো-ডাইলের মাংসের কোর্মা তো খেলেন না মিঃ সেন! ইউ ডোনট্ নো হোয়াট ইউ আর মিসিং···

পরদিন বিকেল। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মিষ্টি বাতাস। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ এখন গোলাপী তাজা ডালিয়ার মতো স্নিগ্ধ, মধুর। রাজেন আমায় ডাক্তার সাহেবের বাড়ী নিয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের পথ। চারিদিকে মেহেদির উঁচু বেড়া, সবুজ মাঠে

টেনিস কোর্ট। ফুলের বাগান আলো করে রেখেছে চারধার। লাল সুরকির রাস্তাটি সোজা গেট থেকে গাড়ী বারান্দায় গিয়ে মিশেছে। দোতলার চওড়া বারান্দায় চেয়ার পাতা। রাজেন আমায় সোজা দোতলার উত্তর প্রান্তের ঘরে নিয়ে এল। দুটি মেয়ে বসে আছে মেঝেতে কার্পেটের ওপর। ওদের সামনে বছর ত্রিশের একটি সৌখীনগোচের লোক, ঝুঁকে পড়ে হারমোনিয়ামের রীড-এ কী করছে। রাজেন বেশ গম্ভীর ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে কায়দা করে হাত নাড়ল। বলল,

—এই যে বন্দনা, চন্দনা, তোমরা গান শিখছো! এই হচ্ছেন রবীন বাবু, নমুকে বেহালা শেখাবেন!

তিনজনেই একসঙ্গে চমকে মাথা তুলে আমাকে দেখল। গানের মাস্টারের চোখমুখ বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। সে বিকট শব্দে হারমোনিয়মে বিদঘুটে একটি সুর তুললে। রাজেন ওর দিকে মোটেই না তাকিয়ে ভারিক্কি চালে মেয়ে দুটিকে বললে,

—তোমরা নমুকে খবর দাও, আমি কাজে চললাম! যাই ভাই রবীন, রাত্তিরে দেখা হবে। চটিজুতার দ্রুত ফটাশ্ ফটাশ্ শব্দতরঙ্গ তুলে মিলিয়ে গেল রাজেন।

একটি মেয়ে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরেই জানাল,

—আপনি বসুন দয়া করে। নমু মা'র সঙ্গে কথা কইছে। এখুনি আসবে।

মাস্টার আমার মুখে ও বেহালার বাক্সে আগুনভরা চোখে তাকাল একবার, তারপর গান ধরল। ... বেশ গায় মেয়ে দুটি। একটি গাইলে ভজন, অন্যটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রায় মিনিট পনেরো পরে হারমোনিয়ম বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সৌখীন মাস্টার, গলা ঝাড়ল দুবার। সুগন্ধি রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

—আজ চলি। একটা অনুষ্ঠান আছে কলেজে,... দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ মাস্টার থমকে দাঁড়াল, আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল,

—দেখুন, আপনি একটা সময় ঠিক করে নিন! দুজনে একসময়ে এলে, বুঝছেন তো, এ্যাঁ?

—ঠিক বলেছেন। আমি তাহলে চারটের সময় আসব। একঘণ্টা—

—বেশ, তাহলে পাঁচটা থেকে আমার। মনে থাকে যেন! কড়া চোখে তাকিয়ে সৌখীন মাস্টার বারান্দায় পা বাড়াল।

চোখ ফিরিয়েই দেখি দুটি মেয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখা-চোখি হতেই লজ্জায় চোখ নোয়াল। আমি হাসলাম,

—তোমাদের কার কি নাম বললে না তো?

দুটি মেয়েই একরকম। উনিশ-কুড়ি, ফর্সা রঙ, টানাটানা আয়ত চোখ, পাতলা নাক। দৃপ্ত তরুণী, স্বাস্থ্যের ঝলকানি শরীরের প্রতি বাঁকে বাঁকে। একটি বললে,

—আমি বন্দনা।

—তাহলে তুমি চন্দনা! অন্যজনকে বলে উঠলাম আমি। তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম! আর সেই মুহূর্তেই ভারী রঙীন পর্দা ঠেলে ঘরে এলো একটি মেয়ে। হাতে জলের গ্লাস আর একথালা মিষ্টি। আমার সামনে ছোট্ট তেপায়ার উপর রেখে নমস্কার করল। চমক লাগল আমার। মোমবাতির মত সাদা রঙ, অসহ্য রকম ফর্সা মেয়েটি। রোগা পাতলা শরীরে জড়িয়ে পড়েছে লাল-হলুদ জামদানী শাড়ী। সরু, অতি পেলব দুটি লম্বা হাত। রোগা পাংশুমুখে সাদা চোখদুটি অস্বাভাবিক বড় মনে হয়। যেন সন্ধ্যা তারার মত উজ্জল দিগন্তে ধক্ ধক্ করছে। পাতলা নাক আর রক্তিমাভ ঠোঁট। বছর সতেরো বয়েস। ছোট্ট দুটি বেণী ঘাড়ের দুপাশে দুলছে। ডাক্তার সাহেবের কথা কানে বেজে উঠল: আমার নমু-মার হার্ট বড় দুর্বল, চেঁচাতে পারবে না।

—একটু হাত ধুয়ে নিন! যেন কানের কাছে বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল। আশ্চর্য ম্রিয়মান ঝাপসা ওর গলার স্বর। আমি থালায় হাত দিলাম। ওরা তিনবোন নীচে বসে রইল। একটু পরেই হাতমুখ মুছে আমিও নীচে নামলাম। বেহালার বাক্সটা খুলে ফেললাম। বন্দনা বললে,

—কাল থেকে নমুকে শেখাবেন, আজ আমাদের শোনান একটু!

—বেশ তো! আমি সুর তুললাম। কী বাজাই? আনতমুখী মেয়ে নমুর মুখের দিকে তাকালাম। শান্ত করুণ শ্রীমতী মেয়ে, ওকে কী শোনাই? তবে বাজাই মালশ্রী রাগিনী। শ্রীরাগের প্রিয়তমা মালশ্রী: তার চাঁপার কলি হাতে রক্তপদ্ম, ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে সে আমগাছের ছায়াঘন নিরালায়। গভীর চিন্তায় মগ্ন সে, লতার মত কোমল কৃশাঙ্গী নায়িকা। সাদা নীরক্ত আনন্দগভীর বড় বড় চোখ। শ্রীমতীর দিকে তাকালে প্রাণমন ভরপুর হয়ে যায়—শান্তিতে, প্রাণের আরামে, স্নিগ্ধ-পুলকের আলোকে। ··· মৃদঙ্গ তম্বুরার ঝংকার উঠেছে তার চারপাশে···

• •

কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম খেয়াল নেই। স্বপ্নে ডুবে ছিলাম যেন। আর কেউ ছিল না আমার ব্রহ্মাণ্ডে।... শুধু আমি আর আমার শ্রীরাগের শ্রীমতী নায়িকা। ধীরে বেহালা নীচে রাখতেই ঠিক আমার পিছনে ডাক্তার সাহেবের ভারী কণ্ঠস্বর গম্‌গম্‌ করে উঠল,

—বাঃ, চমৎকার! অদ্ভুত বাজাও তো তুমি!

ভীষণভাবে চমকে উঠে পিছনে তাকালাম। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি। সুদীর্ঘ, বিরাট পুরুষ। গোঁফদাড়ি-সমাচ্ছন্ন মুখ। জ্বলন্ত চোখ। আবার সেই কণ্ঠস্বর,

—আমি ক্লাবে চললাম এখন, মা-মণি।...কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌, ইয়ংম্যান! এবার আর নিঃশব্দ পদচারণা নয়, দুম্‌দাম্‌ শব্দ তুলে নীচে নামলেন ডাক্তার সাহেব। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—কাল বিকেল চারটেয় আসব, নমিতা!

নমিতা তার অস্বাভাবিক বড় চোখ দুটি তুলে তাকাল। আবার সেই সরু পাতার ফাঁকে বিকেলী বাতাসের শিস, ফিস্‌ ফিস গলার স্বর,

—আচ্ছা! বন্দনা হাসিমুখে বলল—

—আমাদের বড় বোনকে লিখে দেব, কলকাতা থেকে বেহালা কিনে পাঠিয়ে দেবে একটা! জানেন? নন্দিনী তার নাম—

—হ্যাঁ, তবে আজই লিখে দাও। আমি চলে এলাম। মাথার ভিতরে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্রীরাগের সুরমূর্চ্ছনা। মধুর বিকেলের আলোয় আকাশ ভরপুর। হোটেলে বেহালা রেখে হেঁটে চললাম গঙ্গার ধারে। যতো ব্যথা-লাঞ্ছনা ও ক্ষুধার ঊর্ধ্বে অকস্মাৎ প্রাণে জেগেছে আজ বিপুল উল্লাস। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে গেছে দিব্যসুরনির্ঝর-ধারায়, মিষ্টি বাতাসে যেন আমারি আত্মার চিরজীবী সুর। মনে হয় এই বৈকালী আকাশ, আলো, বাতাস সব কিছু যেন আমারি উল্লাসের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। নিবিড় উল্লাসে আমার হৃদয় উদার অসীম নীলাকাশের সাথে এক হয়ে মিশে গেল।... পরদিন বিকেলেও বৃষ্টি-ধোয়া আকাশে আলো হেসে উঠল। আমি নমিতার খোঁজে সেই দোতলার ঘরে এলাম। বন্দনা একমুখ হাসি নিয়ে ছুটে এলো।

—ওঃ, আসুন। লিখে দিয়েছি দিদিকে চিঠি, বেহালা পাঠাবে।

—বাঃ, বেশ।

—বসুন, নমুকে পাঠাচ্ছি। চোখে মুখে আলোর ঝলক তুলে চলে যায় সে।

আবার খাবার হাতে লতার মত ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে নমিতা এল। আজ নীলশাড়ি পরেছে সে, যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বৃষ্টি-ধোয়া নির্মল আকাশের মত।

—বাঃ, রোজ রোজ খাবার কিসের? আমি প্রতিবাদ করি।

—বাবার হুকুম। বাতাসের মিষ্ট সুরেলা শিস্ আমার কানে বেজে উঠল,

—বিকেলের চা এখানেই খেতে হবে আপনাকে রোজ। চোখ নামিয়েই ফিস্ ফিস্ করে ওঠে নমিতা। খুশীর হাসিতে ওর মোমের মত সাদা মুখে টোল পড়ল। আমি মাথা নুইয়ে তাড়াতাড়ি খেতে লাগলাম। ক্ষুধা! অনন্ত শূন্য আকাশের ক্ষুধা আমার ভিতরে। আবার সরুপাতার ফাঁকে খুশীর বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল,

—কাল রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? রাজেনবাবু পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একটু ভীতু নার্ভাস লোক উনি—

—এই একটু স্টীমারঘাটে, গঙ্গার ধারে…

—পায়ে হেঁটে?

—পায়ে হেঁটে। কেন বলো তো নমু? আমি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর মোমের মত ফর্সা রোগামুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। যেন খুব লজ্জা পেল নমু, দৃষ্টি নত করে বাতাসের মত আবছা শিস্ দিয়ে উঠল, খুব আস্তে, আঙুলের ডগায় নীলশাড়ীর আঁচল জড়িয়ে জড়িয়ে,

—না, রাত্তিরে ওই রাস্তাটা খারাপ। সবাই বলে। অনেক খুন ডাকাতি—

—ওসব আমাকে ছোঁবে না। তুমি তো আমাকে জানো না! খুশ গলায় হেসে উঠলাম আমি।—আমাকে ওরা কেন মারবে শুনি? আমার তো শত্রুতা নেই কারো সাথে? ওসব বাজে। এসো নমু, আজ থেকে তোমায় শেখাবো—

লতার মত ক্ষীণ পাতলা শরীরটাকে ভাঁজ করে কার্পেটে বসল নমু, সঙ্কোচে জড়োসড়ো হয়ে।

একঘণ্টা পরে যখন উঠে বসেছি, তখন কোন্ মন্ত্রবলে যেন সব সঙ্কোচ দ্বিধা সংশয় জয় করে নিয়েছে মোমের মত সাদা ক্ষীণপ্রাণ মেয়ে।

—রবীনদা, আমার বেহালা যতদিন না আসে আপনারটা রেখে যান্ না।

কী সহজ স্বাভাবিক সুর তার কণ্ঠে। কী নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি বড় বড় সাদা চোখে। নমু! নমু!

—ঠিক বলেছো। এ আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। ওর চোখে চোখে তাকিয়ে হেসে উঠি আমি।—দিনে তুমি রেওয়াজ ক'রো দু' একঘণ্টা।

—দু' একঘণ্টা নয় তো!—খুশীর বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল মিষ্টি সুরে,—ঘুম-খাওয়ার সময় ছাড়া সব সময় বাজাব। আপনার মত বাজাতে না পারলে মরে যাব যে আমি!

—তাই নাকি নমু! সে লজ্জায় তার চমৎকার চোখ নামায় মাথাটা বুকে নুয়ে পড়ে।

নমু! নমু! নমু!

খুশী! খুশী! খুশী!

রাজেনের ছাতা নিয়ে বিকেলে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়লাম। নমু বসেছিল ঘরে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। ওর সাদা মুখে, চকিতা হরিণীর মত বড় ভাসাভাসা চোখে আলো খেলে গেল নিমেষে। মিষ্টি করে হাসল নমু। ফিস্‌ফিস্ শব্দে বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল যেন।—কী বৃষ্টি!

কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে পাশের ঘর থেকে মিহিমোটা কণ্ঠের উল্লসিত হাস্য-রোল ভেসে আসে। শুধালাম,

—ওঘরে কারা, নমু?

—বন্দনা-চন্দনার বন্ধুরা এসেছে। ওদের কলেজের ছেলেমেয়ে। কলেজের বাৎসরিক নাটকের কথাবার্তা বলছে ওরা।—

আবার সেই সন্তর্পণ বাতাসের শিস। আঃ, ওর হার্ট বড় দুর্বল! মোমের মত সাদা ক্ষীণপ্রাণ পাতলা মেয়ে। নমু!

—ওঃ, তোমার কোনো বন্ধু নেই, নমু? বেহালা টেনে নিয়ে আমি ওর চোখে চোখ রাখি। সলজ্জ অপ্রতিভ দৃষ্টিমাখা অতলস্পর্শ গভীর চোখ তার। নমু চোখ নামায়। রাঙা হয়ে ওঠে।

—না। কিন্তু কোনো দুঃখ নেই আমার। বাইরে বেরোই না তো আমি! আমি আর মা। মা কারো সাথে দেখা করেন না। আপনি যে আসেন, তাও জানেন না। দরকার নেই তার কোনো। রবীন্দ্রনাথ আর বৈষ্ণব-কাব্য নিয়ে ডুবে আছেন তিনি। পক্ষাঘাতে একদিক অসাড় কি না।

একটানা এত কথা বলে হাঁপাতে থাকে নমু। এবার চোখ তুলে আমার মুখে রাখে ঝকঝকে দৃষ্টি।—কিন্তু আমার পাঁচ দিদি প্রতি হপ্তায় চিঠি দেয়

আমায়। প্রতিটি চিঠি বারবার পড়ি আমি জানেন? ওরা সামনে এলে মোটেই ভাল লাগে না ওদের। খিটিমিটি, হাম্‌বড়া গল্প, আত্মপ্রচার। হাঁপিয়ে উঠি আমি। কিন্তু ওদের চিঠি এতো সুন্দর! পুরানো যত চিঠি পড়ে সময় কাটে আমার। আপনাকে চিঠি দেয় না কেউ, মাস্টারবাবু?

ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ হাসি ফুটলো আমার। বেহালাটা গলায় ঠেকিয়ে নড়ে বসলাম।

—কেউ লেখে না, নমু! কোনদিন না?

—কেউ না? কোনদিন না, মাস্টারবাবু! ছবির মত পাতলা ম্রিয়মান মেয়ে আর্তনাদ করে কেঁপে উঠল,—মাগো, আপনি বাঁচেন কি নিয়ে? সে তার পাতলা সরু দুই হাতে রুদ্ধপ্রাণ শীতল বুক চেপে ধরে, সাদা দুই চোখে অবাক বিস্ময় থৈ পায় না।

—চিঠি লেখবার কেউ নেই আপনার, মা-বাবা, ভাইবোন? কেউ নেই?

ওর চোখে তাকিয়ে তেমনি হাসলাম আবার।

—কেউ নেই নমু, কেউ নেই। এসো এবার কাজ শুরু করি।

আমার কথার ধার মাড়াল না মোমের মত সাদা নিবন্ত মেয়ে। ওকে মনে হয় যেন জ্বলন্ত একটি স্বল্পায়ু মোমবাতি; নিষ্ঠুর হাওয়ায় তার নিস্তেজ শিখা কাঁপছে। ওই মুখে দিকে তাকালেই মমতায় বুক দুলে ওঠে। সকরুণ ভালবাসায় প্রাণ কাঁদে। হাতখানি বাড়িয়ে সে শিস দিয়ে উঠল,—

—আপনি দূরে চলে গেলে আমি আপনাকে চিঠি লিখবো, মাস্টারবাবু। আমি লিখবো! দেখবেন—!···কী খেলুম, মনে কী দুঃখ হল, কী আনন্দ পেলুম, আকাশ কখন হাসল, কাঁদল; সব, সব! এই নিয়েই তো বেঁচে আছি মাস্টারবাবু! নমু হাঁপাতে লাগল।

—এসো, শুরু করি। ওর বাড়িয়ে-আনা হাতের দিকে নজর না দিয়ে বেহালার তারে ছড়ি ছোঁয়ালাম আমি। কেঁপে উঠল নমু। ফিসফিস করে বলে উঠল,

—আজকে কিছু ভাল লাগছে না। আজ আর শিখে কাজ নেই। আপনি বাজান, আমি শুনি মাস্টারবাবু—

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিবিড় স্নেহে ও সহানুভূতিতে হাসলাম আমি। শান্ত চিররুগ্ন শিশুর দিকে যেমন বুদ্ধিমান বড়োরা তাকায়, তেমনি। বাজাতে শুরু করলাম চোখ বুজে। কী বাজাই এই নিরালা প্রেমঘন মেদুর প্রহরে?

মেঘরাশের বিচিত্ররূপ মোজা-চোখের সামনে ঝলসে উঠে: আকাশ-ছোঁয়া পর্বতমালা থেকে তার সৃষ্টি। সুনিবিড় নয়নমনোহর শ্যামচিক্কণ তার বরণ, মাথায় বিজলীর উষ্ণীষ আর এলিয়ে পড়া ঘন কালো জটাজুট। মদনমোহন রূপ। ডুব দিলাম সেই রূপসমুদ্রে।

বাজনা থামাতেই পিছনে ডাক্তার সাহেবের সিরেট গলার স্বর। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি স্থির, চোখে খুশীর ঝিলিক। নমু সলজ্জ হাসল একটু। উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ কড় কড় শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করে কাছেই কোথায় বাজ পড়ল। নমু একলাকে ডাক্তার সাহেবের প্রকাণ্ড বুকে লুকালো।

—কিরে, মা-মণি। ডাক্তার সাহেবের চাপদাড়ির ফাঁকে মুখখানা স্নেহ-করুণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল।—ভয় পেয়েছিস্? আয়, ঘরে আয়,—নমুর পিঠে হাত বুলিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি।

—সিট্ ডাউন, রবীন। তিনি একটা সোফায় বসে পড়লেন। নমু কার্পেটে বসে তাঁর হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগল ধীরে ধীরে।

—ইয়ংম্যান! যদি কখনো শান্তি পেতে চাও, গহন কোন পর্বতে চলে যেও। যেখানে মাটিতে মেঘ নেমে আসে, বিরাট জংগলে বাতাস পাগলের মত হেঁকে যায়, বর্ষার ঝর্ণা সিংহের কেশরের মত ফুলে ফুলে পাথরের বুকে মাথা কুটে মরে। গাছের সবুজ পাতা যেখানে সূর্যের আলোয় খলখলিয়ে হাসে, উদ্দাম নাচে পাগল হয়ে যায়। প্রকৃতি যেখানে মুক্ত, যেখানে লুকোচুরি নেই। ওই প্রকৃতির বাণীই তো আমি বলে বেড়াই সবাইকে। বি ফ্র্যাংক্, কিছু লুকিয়ে রেখোনা। তবেই মনে শান্তি আসবে, সুখ জন্ম নেবে। খোলো, খোলো! মনের দরজা খোলো! বাট্ ইট্ ইজ নাথিং বাট মেডনেস্,—তাই ওরা বলে! এ্যা? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ, ... প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানাকে যেন খান্ খান্ করে উঠে দাঁড়ালেন বিরাট পুরুষ ডাক্তার সাহেব,—গো অন্, তোমরা বাজাও। আমি এবার বেরোব।

ডাক্তার সাহেবের চওড়া পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। পর্দার ওপারে বারান্দার মোড়ে তার প্রাণোচ্ছল শরীর মিলিয়ে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে তখনও বাতাসে নেচে বেড়াচ্ছে তার অদ্ভুত কথা ও অট্টহাসির রেশ।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ নমুর আনত শরীর জুড়ে যেন কোন অজানা ভয়ের কম্পন খেলে গেল। ওর সাদা মুখে আতঙ্কের ছায়া।

—ভয় পেয়েছো, নমু? সোফায় বসে শুধাই।

বাবার কথা শুনলেই বড্ড ভয় পাই আমি। এই তো শীত এলেই পাহাড়ে চলে যাবেন। তুষার মানবকে খুঁজবেন! আর ভয় দেখাচ্ছেন আপনি, মাস্টারবাবু! গতরাতেও রাজেনদা এসে কত খুঁজে গেল আপনাকে, ভয়ে ঘুমুইনি সারারাত।

—ভয় পাওয়া একদল সুখী মানুষের স্বভাব নমু, ওদের প্রিয় খেয়াল, বাঁচবার অবলম্বন! আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে তেমনি বসে থাকে, অনড়, আনতমুখী একা একা। আমি চলে এলাম।

একটানা চলল বৃষ্টি। একদিন, ছুদিন, তিনদিন। এরপর থামল। হঠাৎ বিকেে আকাশ জোড়া অথৈ নীল জেগে উঠল। বড় আপন মনে এই রোদ, ফুরফুরে গা-শীতল করা বাতাস। বৃষ্টিবন্দী প্রাণ নেচে উঠল। কাপড় পরে দৌড় দিলাম। লাল সুরকির রাস্তা পেরিয়ে দোতলার সিঁড়িতে দৌড়ে উঠতেই দেখা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে। মুখে চুরুট, চোখে নিশ্চিন্ত দৃষ্টি। সুদীর্ঘ শরীরটা টেনে টেনে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন তিনি। গুরুগম্ভীর ধ্বনি ফুটে উঠল চুরুট চাপা ঠোঁট ভেদ করে।

—হ্যালো ইয়ং ম্যান্! কি রকম চলছে বাজনা?

—ভালই। আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকি।

—পারবে নমু? পারবে?

—নিশ্চয়ই! ওর তীব্র দৃষ্টিভরা ছুই চোখে তাকাই আমি।—ওর ভিতরে সুর রয়েছে, কেন পারবে না!

—ঠিক, ঠিক। পাশ কাটিয়ে নামতে লাগলেন তিনি।—আমার আট মেয়েই গানে বাজনায় ওস্তাদ। আই বোষ্ট্ অব দেম্, দিস ইজ মাই সোল্ সেটিস্ফেক্‌শন্।

আজ নমু এলো যেন রহস্যময়ী বনদেবীর মতন। অঙ্গে অঙ্গে গাঢ় সবুজ সিল্কের ব্লাউজ আর সবুজ শাড়ী। ছুটি কালো বেণী মাথার ছুপাশে ঘাড়ের কাছে ছুলছে। হাসল সে।

—মাস্টারবাবু! কী সুন্দর দিন! বড় ভালো লাগছে!

কী সুন্দর! সত্যি সুন্দর! ওর পানে আপাদমস্তক তাকিয়ে সায় দিই আমি। কী বুঝে হঠাৎ লজ্জা পায় নমু, পর্দা ঠেলে ছুটে পালায়। ফিরে

আসে খাবার নিয়ে।·· ছায়ার মত শরীর বেহালার ভারে নুয়ে পড়ছে। মোমের পুতুল যেন, আমার শ্রীরাগের অতি কমনীয় রমনীয় শ্রীমতী নায়িকা। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে যেতে হবে আমাকে আজ। চারদিন যাইনি। এক ঘন্টার আগেই উঠে পড়লাম।

—কী সুন্দর আকাশ! না? নমু আবার বলে উঠল। খুশীর আলো ছড়ালো।

নমু! নমু! নমু!··· খুশী! খুশী! খুশী!

—হ্যাঁ, সুন্দর! তুমি বাইরে যাও না?

—উহুঁ! মোমের পুতুল মাথা নাড়ে। ওর হার্ট বড় দুর্বল। বাইরের উত্তেজনা নাকি সয় না।—আপনি গঙ্গায় যাবেন, না মাস্টারবাবু? বাতাস যেন ফিস্‌ফিস্ করে শিস্ দিয়ে উঠে আমার কানে,—দোহাই, রাত করবেন না! আমরা ভেবে মরি! এতো দূর রাস্তা, একা একা, মাগো! কিসের শঙ্কিত কল্পনায় তার ছায়ার মত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বাসনা জাগে ওই ভীতু ত্রস্তা লতার মত নরম অসহায় মেয়ের হাত জড়িয়ে ধরে ওকে অভয় দিই। বি ক্র্যাংক্!···না, পারলাম না। ডাক্তার সাহেব, পারলাম না! একটু মুচকি হাসলাম শুধু। তারপর চলে এলাম।

পারিনি ডাক্তার সাহেব, ক্র্যাংক্ হতে পারলাম কই আজো!!

কী অপরূপ হয়ে উঠেছে গঙ্গা। বর্ষার আশীর্বাদে হিমালয়-কন্যা কানায় কানায় ভরপুর। অস্তরাগের আভায় এখনো গঙ্গার দিগন্তপ্রসারী জলস্রোত রক্তিম, ঝিলমিল। দূরে ভেসে যাচ্ছে কয়খানি জেলেদের নৌকা। সবল সুরেলা গলায় উঁচু পর্দার সুর ভেসে আসছে কানে। পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল তারা, মাঝ আকাশে নিষ্প্রভ শুক্লাতিথির চাঁদ আলোর মায়া ছড়াবার প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে। এখনি রাত এল। হঠাৎ মনে হল ভূতে পেয়েছে আমাকে। জ্যোৎস্না রাতের রূপের ভূত। পরী বলে গ্রামের লোকে। বালির উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে দৌড়তে লাগলাম।

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় নীল আকাশের আঙিনা স্বপ্নমেদুর। বহুদূর পর্যন্ত গঙ্গাতীরের বালু চিক্ চিক্ করছে। বাধাহীন নির্জনতা আমার চারপাশে। শুধু ভরা যৌবনের নদীর কলকল ছলছল রাগিণীতে চাঁদের সঙ্গে মিলনের সঙ্গীত মৃদুছন্দে। ডানা ঝটপটিয়ে হঠাৎ দু একটি পাখি উড়ে যায় মাথার উপর।

আর এখনো সুদূর গঙ্গার বুকে কোন সুখী উচ্ছল নৌকা থেকে ভেসে আসে প্রাণের সুর। যেখানে ঘূর্নিতে শতপাক খাচ্ছে গভীর জল, চাঁদ যেন শত-সহস্র খণ্ডে খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে সেখানে, উচ্ছল উদ্দাম হয়ে উঠেছে ওরা মিলনের আনন্দে।

মনে হল এই নিরালা নিঃসঙ্গ মুহূর্তে গঙ্গার তীরে এক মহান অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত জন্ম নিচ্ছে সন্তর্পণে : ঐ নিস্ফল দ্যুলোকের উজ্জল নক্ষত্রলোক থেকে, অথৈ নীলের মোহনা থেকে, গঙ্গার আলো-ঝিলমিল শান্ত সুগভীর বুক থেকে যেন জন্ম নিচ্ছে এক মহাসঙ্গীতের সুর। শান্তির সুর। প্রেমের সুর। মিলনের সুর। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সেই বিচিত্র মহামিলনের অমৃতবর্ষী সুরনির্ঝর-ধারা। শুনতে শুনতে চেতনা হারালাম আমি। আমি? আমি কে? কোথায়? সব হারিয়েছি আমি রূপসমুদ্রে।

কিন্তু জীবনে স্বপ্ন ভাঙ্গে, তন্দ্রা টুটে, সুর থেমে যায়। নিরবচ্ছিন্ন নয় কোন কিছু। ছায়া-ঘন আমবাগানের পাশ দিয়ে একা একা ঝিঁঝির ডাক শুনে জোনাকির জলা-নেভা দেখে আমি পথ চলতে লাগলাম আবার। রূপের ও সুরের স্বপ্নে তখনো চেতনা আচ্ছন্ন। চাঁদ তখনো স্বপ্ন ছড়াচ্ছে বৃষ্টিধোয়া আকাশে, মাটিতে, প্রান্তরে, শাখায়, পাতায়।

বারান্দায় পাকড়াও করলে রাজেন. হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেল। উৎকণ্ঠা ঝরে' পড়ে তার গলায়,

—কোথায় ছিলে এতো রাত, এ্যাঁ?

—সবদিন এক প্রশ্ন ভাল লাগে না রাজেনদা! নীল স্বপ্নের রেশ তখনো চেতনা জুড়ে রয়েছে, মেজাজ বিগড়ে গেল। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। —আমার জীবন নিয়ে আমার চেয়ে তোমাদের বেশী আতঙ্ক, এ ভাল নয়···

—আহা, তা নয় ভাই, রাগ করছো কেন? রাজেনকে আজ অদ্ভুত রকম মিষ্টি ও ভব্য মনে হচ্ছে। ওকেও কি চাঁদিনীর মায়ায় পেয়েছিল? আমি ভাল ভাবে চোখ মেলেই তাকাতে পারি না ওর দিকে। স্বপ্ননীল আমার মন, আমার চোখ। ভূতুড়ে পরী ছেড়ে যায়নি এখনো আমাকে।

—তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রানরে ভাই সন্ধ্যে থেকে। স্টিমার ঘাটে যাবার ভরসা হলনা রাত্তিরে। নন্দিনী এসেছে কি না কলকাতা থেকে! তোমার রাত্তিরে ওখানে নেমন্তন্ন, বেহালা এনেছে একটা, ওটা তোমার দেখা চাই আজ রাত্রেই!

এবার তন্দ্রা ছুটে গেছে আমার। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে রাজেনের গোল ফোলা-ফোলা মুখের দিকে তাকালাম। চোখ পিটপিট করছে নিন্দুক রাজেন। আমাকে যেন খাতির করতে চায়। নারীবিদ্বেষী রাজেন।

—যাও মাস্টার, নন্দিনী ক্লান্ত। ওরা তোমার জন্যেও বসে আছে সব। দশটা হলো! বিপুল ঈর্ষা ও ব্যর্থ-বাসনার তির্যকদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে রাজেন। আমি আবার পথে নামলাম।

জ্যোৎস্নায় মাঠের মাঝখানে পাঁচিলতোলা দোতলা বাড়িটাকে মনে হলো রূপকথার রাজপুরী। মরশুমী ফুলের সৌরভে ভরপুর বাতাস। সব ঘরে উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলো। দোতালায় গান শেখার ঘরে ওরা বসেছে সবাই। কলকণ্ঠে ঘরখানি মুখরিত। ডাক্তার সাহেব সোফায় বসে চুরুট টানছেন। বাইরে থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে ওর দাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আর কার্পেটে বসেছে মেয়েরা। হাসছে। একটু সশব্দেই জুতোটা খুলে দোর-গোড়ায় রাখলাম।

—এসো, এসো রবীন। ইউ আর ওয়েলকাম্। দরাজ গলায় বলে উঠে ঘাড় ফেরালেন প্রাণবন্ত পুরুষ ডাক্তার সাহেব। পর্দা ঠেলে আলো ঝলমল ঘরের ভিতর এলাম। ওরা চারজন গোল হয়ে বসেছে দুটো বেহালা ঘিরে। নমু, বন্দনা, চন্দনা—আর ও নিশ্চয় নন্দিনী! তারা সবাই তাকাচ্ছে আমার মুখে, চোখে তাদের হাসির বিদ্যুৎ। চমকে উঠলাম। এই নন্দিনী! বয়েস আমারি মতন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। একরাশ মুক্ত ঢেউখেলানো চুল ঘাড়ের দুপাশে মন্দাকিনী ধারার মত নেমে পিঠের 'পরে লুটিয়ে পড়েছে। সাদা একটি শাড়ী পরেছে সে। চওড়া কপোলে কঠোর ব্যক্তিত্বের ছাপ, তার নীচে জোড়া ভুরুর তলায় নীল চোখ। ডাক্তার সাহেবের মতোই পদ্মপলাশ নেত্র, অনুসন্ধানী মর্মভেদী দৃষ্টি। সোনালী ফ্রেমের চশমা চোখে। চিবুকটা একটু বেশী চওড়া। সব মিলিয়ে মুখটা লম্বাটে ধরণের, পাশ থেকে না দেখে সামনে থেকে দেখলে সুশ্রী ঠেকে। পরিপূর্ণ যৌবন আলো করেছে তার সমর্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর। চওড়া উঁচু কপোলের সঙ্গে একই সরলরেখায় নেমে এসেছে চমৎকার নাক। এতো সুন্দর মানানসই ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নাক এর আগে দেখিনি কোনো মেয়ের মুখে। নন্দিনী ডাক্তার সাহেবের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, প্রথম দর্শনেই বুঝে নিলাম। নন্দিনীই ডাক্তার সাহেবের মেয়ে,—কন্যা! একঝলক আমার মুখে তাকিয়ে যেন সে আমার মূল্য যাচাই করে নিল। বারবার দু'হাত তুলে ছোট্ট নমস্কার করল নন্দিনী। ডাক্তার হেসে উঠে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

—আমার পঞ্চম মেয়ে, নন্দিনী। আজ সন্ধ্যেয় এলো কলকাতা থেকে, তারপর থেকেই তোমাকে খুঁজে তোলপাড় করেছে সব জায়গা, ইয়ংম্যান্!

—কেন? তাঁর পাশের সোফায় বসে পড়লাম আমি।

—কেন! ডাক্তার সাহেবের ঘন গোঁফ দাঁড়ি যেন এই অবাঞ্ছিত প্রশ্নে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তীব্র দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকালেন তিনি।

—আমার নন্দা মাকে চেনোনি তুমি! ও জিদ ধরেছে আজ রাতেই নমুর গুরুজীকে দিয়ে নতুন বেহালা পরীক্ষা করাবে। যদিও কলকাতার সেরা দোকান থেকেই কিনেছে, তবু তোমার অপিনিয়ান্ না শোনা পর্যন্ত!

—কিন্তু সেটা কি কাল হওয়া সম্ভব ছিল না? আমাকে বাইরের চাঁদিনীর মায়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখনো।

—না। সে ধৈর্য আমার নেই, রবীনবাবু! নন্দিনী এবার কার্পেট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, যেন মশালের আলো।—ধৈর্য খুব ভাল ও বড় জিনিষ, মানি। কিন্তু সব গুণ সবাইতো আয়ত্ব করতে পারে না! নিন্, যন্ত্রটা দেখুন দয়া করে, অনেক রাত হল!

চার বোন সরে' বসল। নতুন ঝকঝকে বেহালা তুলে নিলাম হাতে। অতি চমৎকার জিনিষ। বাজারের সেরা জিনিষ এনেছে নন্দিনী।

—কেমন যন্ত্র হল, রবীন? ডাক্তারসাহেবের গলা।

—চমৎকার। এর চেয়ে ভাল বুঝি হয় না! নতুন বেহালার স্পর্শে মনের গুমোট কেটে গেল। হঠাৎ খুশী জেগে উঠল মনে। চোখ তুলে সবার দিকে একঝলক তাকিয়ে সুর তুললাম। আঃ—

—ইয়ংম্যান্। আবার তাঁর গলা!—আজ দেখেছো আকাশে বাতাসে আলোর বান ছুটেছে। যেন নক্ষত্রলোকের মিউজিক শুনতে পাচ্ছি! বাজাবে একটা কিছু? তিনি তাঁর বিশিষ্ট নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন।

নন্দিনী টুপ্ করে' বসে পড়ল আবার। ঝকঝকে দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল আমার মুখে, আমার হাতের আঙুলের ব্যস্ত আনাগোনার দিকে। বাজাব একটা কিছু? ডাক্তারসাহেব বলছেন আজ! আর হয়তো বলবেন না কোনদিন এ জীবনে। নন্দিনীর চোখে তাকালাম। নমু ওর পাশে বসে তাকিয়ে আছে আমার মুখে। আজ নন্দিনীকে শোনাই, আজ চাঁদনীর মায়ায় সবার অন্তর বিবশ। যা বাজাব তাই ভাল লাগবে। প্রাণের নিভৃতে সাড়া জাগাবে।

• বাসন্তীরাগ: নিবিড় যৌবনে ঢলোঢলো অনিন্দ্যরূপ,—বাসন্তী পুরুষের বেশে

সেজেছেন। তার রূপের ছটা উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাকেও হার মানায়। মাথায় পড়েছে সে শিরস্ত্রাণ ও শিখিপুচ্ছ, তার রমণীয় গলায় দুলছে মালতী ফুলের মালা। ডানহাতে ফুলের কুঁড়ি, বাঁ হাতে তাম্বুল। পরান-আকুলকরা সব ভাসিয়ে-নেওয়া যৌবনের ফেনিল স্রোতে সে আনমনা। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে যেমন প্রেমিক শ্যামসুন্দর গোপবালাদের নিয়ে খেলায় মেতেছিলেন, তেমনি উতলা হয়েছে বাসন্তিকা তার সহচরীদের নিয়ে। যৌবনমন্ত্রে ধন্যা সুরূপসী নায়িকা বাসন্তিকা…

সুর থামল। নিঝুম, নিশ্চুপ। বাইরে কী একটা পাখি ডাকছে ধীরে। হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে উঠল ডাক্তার সাহেব,

—রবীন, ভগবান মান তুমি ?—

…ওঁর চোখে তাকালাম। জলজ্বল করছে জিজ্ঞাসার সীমাহীন প্রত্যাশায়। বললাম,

—মানি, যদি চরম সৌন্দর্যের অনুভূতিকে ভগবানের স্পর্শ বলেন।

—এ্যাঁ, হ্বাট্‌স্ ফাইন্! দেয়ার ইউ আর! সশব্দে পা ঠুকে চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন ডাক্তার সাহেব। নন্দিনী আবার মশালের শিখার মত তার প্রখর দীপ্তি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, চশমার কাঁচে আলোর বাল্‌বের প্রতিফলন পড়ে যেন আগুন ধরে গেছে।

—আর নয়, বাবা। রাত এগারোটা। খেতে চলো সবাই! যাকে উদ্দেশ্য করে বাজানো, সে আর আমার রাগিণী যেন এই রূপালি মুহূর্তে এক হয়ে মিশে গেল। দুই মূর্তি। একটি ছবি, অন্যটি সুর। নন্দিনী আর বাসন্তিকা… হঠাৎ চোখে পড়ল : স্থির আবেশমুগ্ধদৃষ্টিতে নমু তাকিয়েই আছে আমার চোখে।

…পরদিন। অপরূপ বিকেল। নতুন বেহালা নিয়ে মেতে উঠেছে নমু। মোমের মত সাদা মুখে আর বড় বড় নীরক্ত চোখে হাসি ধরে না। সারাদিন ধরে বেহালার তারে ছড়ি টানছে সে। যেন ভূতে পেয়েছে। সুরের ভূত।

—তুমি এতো সাত্ তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেললে আমার ভাত মারা যাবে যে নমু! আমার স্বরে স্নেহ-সহানুভূতি ঝরে পড়ে।

লজ্জায় মাথা নোয়ায় ছায়ার মত ক্ষীণাঙ্গী শ্রীমতী মেয়ে।

কিছু পরে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো নন্দিনী। সাদা শাড়ী পরনে। মশালের আলো। দিনের আলোয় যেন দ্বিগুণ দীপ্তিতে জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই কপট শঙ্কার ভঙ্গিতে কানে হাত রাখল,

—বাবারে! ভোর থেকে কান ঝালাপালা। আর সহ্য হয় না। বুঝলেন গুরুজী? কাল সকালের গাড়ীতেই যাচ্ছি। আজ রবিবারটা থেকে গেলাম। আজ রেহাই দিন। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

অবাক আহত দৃষ্টি তুলে ওর দিদির মুখে তাকাল নমু। নন্দিনী গ্রাহ্যই করলে না।

—আপনি সবদিন বিকেলে যেখানে নিরুদ্দেশ হয়ে যান, সেখানটা দেখতে চাই আমি!

—কিন্তু, বুঝলেন কিনা, মানে জায়গাটা! আমতা আমতা করি আমি।

—জানেন, ভেসিলেশন্, উইক্‌নেস্, টিমিডিটি এসব হচ্ছে ক্ষয়ের লক্ষণ, বলেছেন এক মনীষী। আমি সূত্রটা মানি। কাম্ এলঙ্! নমু যাবি? না, তোর হার্টে রাস্তার ঝাঁকুনি সইবে না!

ব্যথাহত চোখদুটি নামিয়ে নীরবে বেহালা বাক্সে পুরে রাখে নমু।

—তাহলে বেড়িয়ে আসুন, মাস্টারবাবু!

বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল। বড় বড় চোখ দুটি ক্ষণিক আমার চোখে রাখল নমু ধীরে ধীরে বেহালার বাক্স হাতে ঝুলিয়ে পর্দা ঠেলে মিলিয়ে গেল। গলা ফুটে আর্তনাদ বেরোতে চাইল আমার,—আমি যেতে চাই না নমু, যেতে চাই না! কোনো শব্দ বের হল না। দৃপ্ত সুরে আদেশ জানালো নন্দিনী,

—চলুন গুরুজী! হেসে উঠল প্রাণবন্ত সুরে। যৌবনের ঝর্ণাধারা, উচ্ছল, উদ্বেল প্রস্রবণ—নন্দিনী। কী কঠোর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ওর চমৎকার নাক, প্রশস্ত কপোল। জলজলে চোখের সম্মোহনী দৃষ্টি। আমি অসহায়ের মত তার ইচ্ছার স্রোতধারায় আত্মসমর্পণ করলাম। বেরিয়ে এলাম ওর পিছু পিছু।

নন্দিনী সেই জাতের মেয়ে যারা পৃথিবীতে আসে সব কিছুকে জয় করে নিতে। তাদের গতিময় ইচ্ছার চাকায় বেঁধে চালাতে চায় পুরুষসমাজকে। বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, পরাধীনতা যারা সয় না। যারা রাণীর জাত, নন্দিনীর জাত!

গাঢ় নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ। সোনালী রোদের দীপ্তি কমে এসেছে। একটা ঘোড়ার গাড়ী থামিয়ে উঠে পড়ল নন্দিনী, চাঁপার কলির মত আঙুল নেড়ে ইসারা করল আমায়,

—চেয়ে আছেন কি? আসুন!

পথের বাঁকে চায়ের দোকানটার দিকে তাকাতে তাকাতে আমি উঠে পড়লাম গাড়ীর ভিতরে। তার পাশে আমি। গরবিনী রাণী। উপরে তাকিয়ে হুকুম

দিল নন্দিনী,—চালাও, স্টিমার ঘাট! তারপর আমার দিকে তার মুখ ফেরাল। আহা, এতো কাছাকাছি সেই সুরভিত শুভ্র গোলাপের মত মুখ! নিমেষে নেশা ধরে গেল। জানালাটা খুলে দিল নন্দিনী। নড়ে বসল একটু, হাসল আমার চোখে চোখ রেখে, চশমার আড়ালে যেন নীলকমল বিকশিত হল, রক্তিমাভ পাতলা ঠোঁট থেকে যেন শুভ্র সুস্নাত গোলাপের পরিপূর্ণ সৌরভ ছড়াল।

—কী দেখছিলেন ভীতুর মতন রাস্তার দিকে তাকিয়ে? চুরি করতে যাচ্ছেন নাকি?

—চায়ের দোকানে রাজেন বসে চা খাচ্ছিল। তাকাচ্ছিল এদিকে!

—রাজেন! হঠাৎ যেন সুবাসিত গোলাপে মশালের শিখা দপ্ করে জ্বলে উঠল, সোজা হয়ে শিরদাঁড়া টান করে বসল নন্দিনী, দীপ্ত ভঙ্গিমায় ঘাড় বেঁকিয়ে চওড়া চিবুক তুলে ধরল আমার দিকে। তার সম্মোহনী দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকিয়ে খপ্ করে অতর্কিতে আমার ডানহাতের মুঠি ধরে সাপের মত সে হিস্ হিস্ গর্জন সুরু করল,

—তুমি কি রবীন! তুমি কি! ছিঃ, এতো বড় গুণী তুমি, আর ওই একটা স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোও! গতরাতে তোমার বেহালা শুনে ঘুমুইনি সারারাত, জানো? তোমার নিজের শক্তি কত বিরাট, তা কি জানো না তুমি, রবীন? নিজের শরীরের ওজন না জানলে যেমন বেঘোরে মানুষ মারা পড়ে ব্যায়রাম হয়ে, তেমনি মনের আর গুণের ওজন না জানলেও···

আমার পাশে যেন ফুটে আছে তাজা শুভ্র গোলাপ। তার সুরভি আমায় মাতাল করে তুলেছে। তার স্পর্শ আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। তার মায়া আমায় জয় করে নিয়েছে। আমার ডান হাতের মুঠি পুড়ে যাচ্ছে যেন। তার কোলে নিস্তেজ পড়ে রয়েছে। ছাড়াতে গেলাম। পারলাম না। শক্ত মুঠিতে ধরে রেখেছে অফুরন্ত যৌবনের দেবী। গরবিনী সম্রাজ্ঞী, যে তার প্রিয় সবকিছু নিঃশেষে জয় করে নিতে চায়। রাণীর জাত। আঃ, পুড়ে গেল, সব পুড়ে গেল।···শহর ছাড়িয়ে নিরালা পথে এসে পড়েছে গাড়ী। উঁচু নীচু ভাঙ্গা পথে ঘোড়াটা চলতে কষ্ট পাচ্ছে, অনবরত দুলছে গাড়ী। দুলছি আমরাও, সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে। নন্দিনীর ঢেউখেলানো চুলের উড়ন্ত দু'এক গুচ্ছ আমার গালে গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, থেকে থেকে ওর কাঁধ এসে ঠেকছে আমার কাঁধে। আমার হাত ওর মুঠোয়। আর আমার হৃদয়, আমার মনপ্রাণ, আমার আত্মা? সব পুড়ে গেল, সব জ্বলে গেল! নমু, আমায় বাঁচাও! নমু, এতো আমি চাইনি!

আমার চারপাশে শুধু সম্রাজ্ঞীর মত গরবিনী নন্দিনীর সুরভি। নন্দিনীর উত্তাপ।

হঠাৎ রাস্তার গর্তে চাকা পড়ে প্রবল ভাবে দুলে উঠল গাড়ী। গাড়োয়ান উপরে বসে হৈ হৈ করে উঠল। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম আমি, নন্দিনী টেনে ধরল আমাকে। আর সামলাতে পারলাম না। সব ধৈর্য তার সুরভির বন্যায় ভেসে গেল। দুহাতে মুখ ঢেকে নন্দিনীর কোলে লুটিয়ে পড়লাম। শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আমার দুচোখে কান্নার স্রোত। গলা ঠেলে প্রাণ-নিঙড়ানো নিবিড় বেদনার জ্বালা যেন দলা বেঁধে উঠতে চায়। গভীর সহানুভূতিতে নন্দিনী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে। কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠে,

—রবীন, রবীন, কেঁদো না!···কি হয়েছে তোমার, রবীন? আমায় বলো—

ওর কোলে মাথা রেখেই চোখ তুলে ওর মুখে তাকালাম। গলা ফুটে স্বর বেরোতে চায় না—নম্র মতন।

—আমি বড় দুঃখী, নন্দা। বড় ব্যথা, কাউকে বলবার নয়···।

—আমায় বলো, রবীন, আমায় বলো। দুহাতের আমার চুলের ভিতর আঙ্গুল বুলাতে থাকে সে। পুড়ে গেলাম, জ্বলে গেলাম! সুরভিত গোলাপের মর্মে এতো উত্তাপ!

—তোমরা কেউ বুঝবে না নন্দা। কী-এক সুর যেন আমাকে পাগল করে তুলেছে। তাকে ছুঁতে পারি না। গতরাতে গঙ্গার তীরে শুয়ে শুয়ে একটু তাকে অনুভব করতে পেরেছিলাম শুধু। ওই আকাশের নক্ষত্রালোক থেকে, নদী থেকে, বনজংগল সমুদ্র পাহাড় থেকে ভেসে আসে সেই সুর। আমি ধরতে পারি না। এ আমার পাগলামি নয়, নন্দা। বিশ্বাস করো, এরই খোঁজে আমি খ্যাপার মত ছুটে বেড়াই, কেউ বোঝে না আমাকে। এ জীবনে কেউ বুঝতে পারলো না, হয় তো পারবে না। এ যে কী জ্বালা, কী মর্মান্তিক বেদনা, অসহনীয় দুঃখ, নন্দিনী! সৃষ্টির যন্ত্রণা, সৃষ্টির পীড়ন। 'আমার বুকের জ্বালা কাউকে বোঝাতে পারি না, কেউ বোঝে না, এর বড় দুঃখ বুঝি মানুষের নেই।

—কেঁদো না, রবীন, কেঁদো না! নন্দিনীর হাত থেকে যেন এখন শান্ত শীতল ধারা ঝরে পড়ে।—উঠে বসো রবীন।

উঠে বসলাম। নন্দিনী তেমনি আমার হাত তার দু'হাতের মুঠোয় ধরে বসে রইল। আমরা নিশ্চুপ। নিথর। শুধু গাড়ীর দোলানির সাথে আমাদের

মাথায় ও কাঁধের ছোঁয়াছুঁয়ি ; কেউ কোন কথা বলি না। বলতে পারি না। আকস্মিক এই বাঁধভাঙ্গা অধৈর্য পাগলামির আত্মপ্রকাশের জন্যে লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছি আমি। নন্দিনীর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। ধীমতী দৃপ্তদৃষ্টি তরুণীর কোলে মাথা রেখে পাগলের মত ভাবাবেগে আমার আর্তনাদ ক্ষমা করবে কি নন্দিনী ? আমি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। ফলশূন্য আমবাগানে লাফালাফি করছে বানর হনুমানের দল। আলো ছায়ার রূপ। এবার দুধারে উদার মাঠ সবুজ শস্যের আশীর্বাদে শ্রীমতী মেয়ের মত মুখ জুড়ে হাসছে। বিকেলের আলো নেমেছে পৃথিবীতে। সাদা মেঘের টুকরো রাঙা হয়ে উঠল। নন্দিনী আমার হাতে তার আলতো হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। জানি, জানি, এ বুঝতে পারি আমি, আমার অসহায় উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশে সে তুষ্ট ; অপরাধীর কাছ থেকে গোপন কথা আদায় করে যেমন বিচারক এক তুষ্টীভাব নিয়ে তাকায়, তেমনি সে দেখছে আমাকে—গরবিনী সম্রাজ্ঞীর মত। ···গাঢ় স্তব্ধতা ভাঙ্গল নন্দিনী, প্রায় কানে কানে বলার মত ফিস্ ফিস্ করে উঠল সে,

—একটু আগে যে তুমি অমন সেন্টিমেণ্টাল্ হয়ে পড়েছিলে তার জন্যে লজ্জা পেয়ো না রবীন। আমি কিছু মনে করিনি। এইতো সেন্টিমেণ্টাল্ হবার বয়েস, পাঁচ বছর পরে আর এ দোষ বা গুন যাই বলো, থাকবে না।

—তুমি রাগ করনি ? সত্যি ? ভয়ে ভয়ে ওর প্রদীপ্ত চোখেমুখে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে উঠলাম।

—না, না, না! সেন্টিমেণ্টালিজম্ তারুণ্যের ভূষণ, রবীন! মাঝে মাঝে এর দারুন দরকার! বড় প্রিয় মনে হয়! দেখো, স্টিমার ঘাটে এসে পড়লাম।

সামনে ধূ ধূ বালির চর, দিনান্তের আলোয় চিকচিক করছে। ঘোড়ার গাড়ীওয়ালাকে পয়সা মিটিয়ে দিল নন্দিনী। ঘোড়াটা মুখ ঘুরিয়ে টুং টাং ঘণ্টা দুলিয়ে আবার সশব্দে শহরের দিকে চলে গেল।

—গাড়ীটা ছেড়ে দিলে যে! ফিরবো কেমন করে ?

—প্রতিদিন যেমন করে' তুমি ফেরো। নন্দিনীর চোখ দুটি কৌতুকে চিকচিক করছে। বালির উপর দিয়ে পা টেনে টেনে এগোই। ডুবন্ত সূর্যের লাল আলোয় ওর মুখে কেমন এক স্বর্গের সুষমা ছড়িয়ে পড়ে। যেন মহাভারতের স্বর্গীয় দেবীর বর্ণনার সঙ্গে ওর রূপ মিলে যাচ্ছে। যেন রক্তিম আলোয় ঝিলমিল গঙ্গার বুক থেকে লক্ষ্মী অমৃতের ভাণ্ডার নিয়ে উঠে এসেছে।

নিস্তেজ চাঁদ উজ্জলতর হয়ে উঠেছে ক্রমশ। অপরূপ রাত। নন্দিনী আমার বাঁ পাশে এসে হাত ধরল,

—উঃ, রবীন! তুমি সত্যি একটি জিনীয়াস! কী চমৎকার জায়গাটি আবিষ্কার করেছো। মনে হয় কত যুগ এমনি নিরালা পৃথিবীর কাছাকাছি বসে আকাশের গান শুনিনি!...তারপর হঠাৎ সজোরে আমার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল নন্দিনী,

—ভালো কথা! তোমাকে ওই রাজেনের সঙ্গ ছাড়তে হবে!

—রাজেনকে যত খারাপ ভাবো তত খারাপ নয় সে। দোষেগুণে মানুষ!...

—না, না, না! বিষম রাগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে, আরো জোরে আমার হাতে ঝাঁকুনি লাগায়,

—ওটা একটা স্কাউণ্ড্রেল! বাবা একটু খ্যাপা মানুষ! কিন্তু ওর মত সাধু আর বিরাট অন্তর কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি বলে রাখলাম, রবীন! অসৎটা পথে পথে ফিরছিল। কোন বিদ্যে নাই, বাবা ওকে দয়া করে ঠাঁই দিলেন। আর ও বাবার নামে যা ইচ্ছে বলে বেড়ায়। আবার জ্যোতিষ নিয়ে টানাটানি করে। বাবাকে নাকি বলেছে উনি বিরাট কোনো আবিষ্কার করে অমরত্ব লাভ করবেন। এইতে—আমাদের ভোলানাথ বাবা গলে গেলেন। বাবার মাথায় উঠেছে তুষার-মানব খোঁজার ভূত। রাজেন! ওটাকে দূর করবো আমি! দাঁতে দাঁতে শব্দ করল সে। —চরিত্রহীন! বছর দুই আগে একটা বিধবা মেয়েকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী করেছিল, জান? নন্দিনী হাসল, —তোমার বন্ধুকে একদিন জিগ্যেস করো বিমলার খবর কি? তাহলেই শুনবে সব। শয়তান!

—তাইতো বলছিলাম রাজেন আমাদের গাড়ীতে দেখেছে। আমি হেসে বললাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালই সারা শহরে রটে যাবে, নন্দিনী রবীনের প্রেমে পড়েছে। দেখো তুমি! কত কিছু রটাচ্ছে। তবু বাবার হুঁস নেই। তা হোক, ওটার সাথে থাকতে পারবেনা তুমি। আমি কাল সকালেই যাচ্ছি, কিন্তু আজই বন্দোবস্ত করে যাব। তুমি আসবে আমাদের বাড়ী...

—কিন্তু ..আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ঝলসে ওঠে নন্দিনী।

—উহুঁ, কোনো কিন্তু নয়। তোমাকে বানের জলে ভেসে যেতে দেবনা আমি, রবীন! গান বাজনা একটু আধটু আমিও জানি। তোমার শক্তি টের পেলাম

গতরাত্রে। তুমি এসো, অমত করোনা রবীন! একটা অবলম্বন ছাড়া কারো চলেনা, জানো? ওই যে অমন প্রচণ্ড শক্তিধর সূর্যের আলো, সেও মহাশূন্যে কোন একটা আশ্রয় বা অবলম্বন না পেলে নিজের রূপ প্রকাশ করতে পারেনা। তোমার আমারও বেলায় তাই।

—আমি এলে তুমি খুশী হবে?···চাঁদ মায়া বুলিয়ে চলেছে। আমার মুঠোয় নন্দিনীর কোমল যৌবনোচ্ছল গরম হাত। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন। আমার গলা আনন্দে বুজে আসে। চাঁদ তৃপ্তি ছড়িয়েছে আমার তৃষ্ণার্ত মনে।

—খু-উ-ব খুশী হবো রবীন। খু-উব,—নন্দিনীর গলাও বুজে এলো···

আবার নীরবে হাঁটতে লাগলাম আমরা দুজনে। দুধারে চাঁদের স্বপ্ন। বললাম,

—কিন্তু পায়ে হেঁটে তোমার যাওয়াটা নিরাপদ নয়তো, নন্দা—

আবার তার সুরে আগুন ঝরলো। গৌরবদীপ্তা আত্মসচেতন সম্রাজ্ঞীর সুর।

—জানো রবীন! আমাদের পাগলাটে ভোলানাথ বাবা মন্ত্র শিখিয়েছেন আমাদের: বি ক্র্যাংক! আর কাপুরুষ হয়োনা! আমরা মনে প্রাণে সেই মন্ত্র গ্রহণ করেছি। আমরা সাহস প্রেম আর অকপটতা নিয়েই বাঁচতে চাই রবীন। বাবা আরো বলেন, নিজের জীবনকে ভালবাসো, তাহলেই জগৎকে ভালবাসতে শিখবে। তোমাকে ঘৃণা করুকনা মানুষ, তবু তুমি ওদের ভালবাসো। যে ঘৃণা করে, সে যে আরো বেশী অসহায়!

আমি ওর হাতের মুঠোয় নীরবে চাপ দিলাম একটু। কানে কানে বললাম,

—আমি শুধু ঘৃণ্যকেই ঘৃণা করি, নন্দা। জানো, যখন কেউ নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে, তখনি সে অন্যকে আঘাত হানে। আর ভালবাসা? আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলেছে, সে কবি:

Love triumphs where sword fails!

—কিন্তু ভালবাসাও দোষমুক্ত নয় যে রবীন! সে আমার হাতে চাপ দিল। ···অন্তর যেখানে ছলনায় লোভে মোহে ভরা, ভালবাসা সেখানে এই চাঁদের আলোর মতন; এ উত্তাপ দেয়না, পথ চিনিয়ে দেয়না, প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেনা আত্মাকে। এশুধু লাভের খাতায় প্রতিদান চায়। আর অন্তর যেখানে সহজ শুভ্রতায় সতেজ আর ঝর্ণাধারার মত পবিত্র স্বচ্ছন্দগতিময়, সেখানে ভালবাসা প্রাণ প্রেরণাদায়িনী শক্তি, ভোরের ঘুম ভাঙানো সোনালী আলো!···নন্দিনী যেন

স্বপ্নে আচ্ছন্নের মত নিজেরই আত্মাকে তার বাণী শোনাচ্ছে। তেমনি মিহি আত্মগত সুরে বলে যেতে লাগল সে,—সূর্য যেমন পৃথিবীর জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে সৃষ্টির আদিকাল হতে, তেমনি ভালবাসা পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মানবগোষ্ঠিকে—এ সবই আমার খ্যাপা বাবার কথা, রবীন!

—নন্দিনী! হঠাৎ আমার স্বরে সোনা ঝরে পড়ল। নিজের কানেই অবাক লাগল। মুখ নুইয়ে তার কানে কানে গেয়ে উঠলাম,

—আমি অতীতকে ভুলে যেতে চাই, নন্দিনী! আর ভুলিও। পড়নি শেলির কবিতা? ‥

The world is weary of the past!

সাপের খোলস ছাড়ার মতন আমাদের পৃথিবী নিত্যনূতন রূপে জন্ম নিচ্ছে প্রতি ভোরে।

—কিন্তু আমার যে ভবিষ্যতে ও ভরসা নেই, রবীন? শুধু বর্ত্তমান। তবে আমিও শোনাই কবিতা তোমাকে: লং ফেলোর—

…Trust no future, however pleasant,
Let the dead past bury its dead;
Act, act in the living present,
Heart within and God o'er head…

—বাঃ! আমি বললাম। —আমার অতীত নেই; কিন্তু আজকের এই আকুল চাঁদিনী, স্বপ্নভরা নীল আকাশ, এই নির্জনতা, আর তোমার আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার মত পথ হেঁটে যাওয়া, এ আমি কোনদিন ভুলবোনা। ভুলতে চেষ্টা করবোনা, নন্দিনী!

—আর তুমিও আমার মনে মনে থাকবে রবীন। কেন জানো? তোমার বেহালার সুর আমার কানে কানে ফিরবে বলে! আমায় সহজ সস্তা ভেবোনা রবীন। তোমার বেহালার সুর ছাড়া তুমি একটি জলহীন সরোবরের মত কুশ্রী গহ্বর, তা জানো?

—জানি নন্দিনী। জানি! ওর হাতে চাপ দিলাম আবার। —আমিও তোমাদের মন্ত্র নিলাম এই চাঁদিনী রাতে। ফ্র্যাংক্ হবো, কাওয়ার্ড হবোনা! সহজ হবো জটিল হবোনা!

—তোমার কবি বন্ধুর আর একটি কবিতা শোনাওনা, রবীন! আদুরে কচি মেয়ের মত শোনাল,

• •

-যতটুকু মনে আছে তোমায় শোনাই, নন্দিনী!

Friend! come up to me!
Let me embrace you
And feel the fire in your heart
That guides me and gives me warmth-

মানুষের মনে আনন্দের জন্ম জীবনের একটি দুর্লভ ও শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর ঘটনা। আমার মনেও এই আনন্দের মূর্তি জেগে উঠল এবার। যেন কোনো শীতল ছায়া-সুনিবিড় আনন্দের সরোবরে ভেসে চলেছি আমি দিনরাত। মনে হয় জগতের সবকিছু সুন্দর, প্রেমময়; যেন সব কিছু থেকে সুর বিচ্ছুরিত হচ্ছে অহরহ। এই আনন্দে আনন্দে বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এলো। আকাশে খুশীর রেশ লাগল। বিবাগী মেঘের টুকরো মনের আনন্দে আকাশের দরিয়ায় পাড়ি জমাল। গঙ্গার তীরে কাশ ফুল ফুটে একাকার, যেন আকাশের মেঘ নেমে এসেছে মাটিতে। নদীর ধূ ধূ সাদা চিক্‌চিক চরে শস্যের সবুজ কার্পেট খুশীর হাসি হাসছে।

এর মাঝে নন্দিনী দু'খানা চিঠি দিয়েছে তার কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে। জবাব দিইনি। নমুর বেহালা বাজনা আশ্চর্য গতিতে এগোচ্ছে। নমুদের বাড়ির একতলায় সুন্দর ঘরে থাকি, রাজেনের সঙ্গে হঠাৎ কোনদিন দেখা হয়ে যায়। কাচুমাচু করে সে,

—তোমাকে মেনেছি ব্রাদার! গুণী লোক, ভাগ্যবান!

—ভাগ্যবান কেউ নয়, রাজেন দা। সাধনা করলে তুমিও গুণী হতে পার। নন্দিনীর এককোঁটা কৃপার প্রত্যাশায় মন খাঁ খাঁ করছিল তার, তাই আমার উপর নন্দিনীর শুভদৃষ্টি সইতে পারছে না রাজেন। আর নিন্দা করতেও ভয় পায় আমার কাছে। স্পষ্টবাদী রাজেন। নারী-বিদ্বেষী রাজেন।

আকাশে বাতাসে এমনি যখন আমার মনের মত নীল উজ্জ্বল নিশ্চিন্তনা, তখন পুজার ছুটিতে এলো নন্দিনী। যেন দ্বিগুণ সুন্দর হয়ে এলো। রাত্রে স্টিমারঘাট থেকে ফিরে সবে মাত্র জুতো খুলছি, মৃদু শব্দে চোখ তুলে তাকালাম। দরজার পর্দা সরিয়ে সে দাঁড়িয়ে। মশালের শিখার মত দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে যেন। আত্মহারা দৃষ্টিতে ওর মুখে তাকিয়ে স্থির বসে রইলাম আমি। নন্দিনী এগিয়ে এল, আমার হাত ধরল। যেন মশালের লাল আগুনে পুড়ে গেলাম আমি।

—ছাড়ো নন্দা, ছাড়ো, কখন এলে ?

রাণীর জাত। অসহিষ্ণু গরিমাতপ্ত সম্রাজ্ঞীর রক্ত বইছে তার ধমনীতে। বিজয়িনী নন্দিনী। নমু হার মেনে সরে দাঁড়িয়েছে একান্তে—

আরো জোরে আমার দুহাত চেপে ধরে নন্দিনী আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়। ওর আগুনে-পোড়া নিশ্বাস আমার চোখেমুখে গ্রীষ্মের দুপুরের হল্‌কা ছিটিয়ে চলে, ওর চোখ যেন অন্তহীন নীল আকাশের মতই আমায় ছেয়ে ফেলে। চেতনা আচ্ছন্ন করে ওর দেহ সৌরভ।

—কেন ছাড়বো, রবীন ! কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে নন্দিনী। তার তাজা যৌবনের মাদকতা-মাখা সুগন্ধে যেন পাগল হয়ে উঠছি। আমি জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছি প্রতি মুহূর্তে !—রবীন, রবীন ! তার আগুনের হলকার মত নিশ্বাস আমার মুখ পুড়িয়ে দেয়। অপরূপ যৌবনরাঙা তার তনুদেহ যেন রহস্যময়ী চুম্বক, অসহায় লোহার পিনের মত থরো থরো কাঁপছি আমি।—একটি মুহূর্ত তোমায় ভুলতে পারিনি রবীন ! কি যে করলে আমায় ? অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসছে নন্দিনী বিজয়িনী নির্মম সম্রাজ্ঞীর মত,—স্বার্থপর, তৃষার্ত, গরবিনী।

—দোহাই নন্দা, ছেড়ে দাও। আমায় ছাড়ো ! আপ্রাণ চেষ্টায় আমার গলা ফুটে আর্তনাদ বের হলো…

—কেন রবীন ? কেন ? অবাক চোখে তাকায় নন্দিনী।

আমার সামনে পর্দার গায়ে যেন কোন গোপনচারিণীর ছায়া পড়ল। চাঁদের আলোর মত নিঃশব্দ আনাগোনা তার।

—এসো, নমু ভিতরে এসো। আমার সুরে মুক্তখুশীর আমেজ। সতেজ আমন্ত্রণ। তীরের মত ছিটকে দূরে সরে গেল নন্দিনী। পর্দার ওধারের ছায়াটা একটু কেঁপে উঠল, বাতাসের ক্লান্ত সন্তর্পণ শিস ভেসে এলো,

—দিদি, তোমরা খেতে আসবে ! এখুনি !

—তুমি এসো নমু ! ভিতরে আসছো না কেন ? নন্দিনীর বাক্যহারা মুখের দিকে তাকিয়ে উৎসাহে বলে উঠি আমি। মৃদুসঞ্চারিণী ছায়া নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

—কি নন্দা, ছোটবোনের সামনে ফ্র্যাংক্ হতে পারলে না ! দূরে সরে গেলে— আশ্চর্য ! অভাবিত মুক্তি পাওয়ার আনন্দ আমার কথায়। আমি হেসে উঠলাম আনন্দে।

—তুমি বড় শিল্পী হতে পার রবীন, বড় গুণী হতে পার, কিন্তু…দপদপ্ করে মৃণালের মত দূরে দাঁড়িয়ে জ্বলছে নন্দিনী, ওর নিটোল বুক দ্রুত উঠছে নামছে,

গ্রীকমূর্তির মত অনিন্দ্যসুন্দর নাক ফুলে ফুলে উঠছে। অপরূপ রূপ! অবিস্মরণীয়। সাপের মত রাগে ফুঁসে উঠল সে,

—কিন্তু তুমি একটা ইডিয়ট্! ইডিয়ট্! আই পিটি ইউ! ইউ ইডিয়ট্!

এতক্ষণে মনের আনন্দে হা হা করে হেসে উঠলাম আমি। সবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নন্দিনী। এরপর যে ক'দিন ছিল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল নন্দিনী। প্রায় কথাই বললনা। পুজোর দুইদিন পরে বিকেলে নমু বলল,

—দিদি কাল চলে যাচ্ছে!

—এতো শীগগির?

—হ্যাঁ, সামনের বছর ডাক্তারীর ফাইন্যাল পরীক্ষা কিনা, পড়াশোনা হচ্ছেনা এখানে।

—ওঃ! মনের খুশীতে শ্বাস ফেললাম আমি। —নমু, তুমি খুব স্মার্ট মেয়ে, অনেকখানি শিখে নিয়েছো এরি মধ্যে, আজ তোমাকে একটি রাগিনী শেখাই, কেমন?

আহ্লাদে নমুর মোমের মত সাদা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় দু'ঘণ্টা আমরা বাজিয়ে চললাম। সেদিন আর বেড়ানো হলনা। রাত্রে খেতে বসে হঠাৎ চোখ তুলল নন্দিনী।

—কাল সকালে চলে যাচ্ছি, রবীন। এবার ভাল পড়াশোনা করতে হবে!

—তা তো বটেই! নিশ্চয়! ওর চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। ঠোঁট কামড়ে চোখ নামায় সে। ডাক্তার সাহেবের ভরাট গলার স্বর বেজে উঠে,

—নন্দিনী যদি ভাল পাশ করে ওকে বিলাত পাঠাব, বুঝলে রবীন?

—সে খুব ভাল হবে। সানন্দে সায় দিলাম আমি। কটমট চোখে নন্দিনী তাকাল আমার দিকে। তার পাতলা রক্তিমাভ ঠোঁটদুটী কেঁপে উঠল, চশমার কাঁচে আলো ঝলসে গেল, তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল,

—বেহালাটা খুবই ভাল বোঝ, রবীন, আমি মানি! কিন্তু অন্য কারো কিসে ভাল হবে না হবে সে সম্পর্কে তোমার মতামতটা অভ্রান্ত নয় জেনে রেখো! ডোণ্ট বি সিলি!

—নন্দা! বিস্ময়াহত চোখ তুলে তাকালেন ডাক্তার সাহেব।

—রাগ করছো কেন, নন্দিনী! তুমি অসাধারণ, তোমার সঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারছিনা বলে রাগ করছো কেন? তার জ্বালাধরা দুই চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে হেসে বললাম। চশমার ওপার থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে

যেন পুড়িয়ে ফেলতে চায় সে আমাকে। ঠোঁট কামড়ে ধরল নিষ্ফল আকাশে নাগিনী।

হঠাৎ পাথুরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সবাই নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। শুধু নমু চোখ তুলে তাকাচ্ছে সবার মুখে। সাদা বড় বড় চোখ। সরলতা মাখা। অবোধ বিস্ময়ের দৃষ্টি; নমু! নমু! নমু! এতো ক্ষীণ সে, এতো স্বচ্ছ, এতো পাতলা। যেন রক্তমাংসের দেহ নয়, মহান শিল্পীর আঁকা তেলরঙা ছবি একখানি।

—নন্দা, মাই ডিয়ার, স্তব্ধতা ভাঙলেন ডাক্তার সাহেব,—তোমার ভিতরে কী একটা অশান্তি, আই ডোণ্ট নো; সামথিং; আঃ,—নইলে মিছিমিছি তুমি অপমান করো রবীনকে! ওয়ান থিং মোর, তুমি এখনো ফ্র্যাংক হতে পারলেনা, মাই ডিয়ার—মিছিমিছি! সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে উঠল নন্দিনী;

খাওয়া শেষ হল।

পরদিন কখন চলে গেল নন্দিনী বলতে পারি না।

পূজার পরেই নভেম্বর মাসের শীত এসে পড়ল; আমার আনন্দের সরোবর শুকিয়ে গেছে; বড় ক্লান্তবোধ করি আজকাল, হাঁটতে ভাল লাগে না; শিবপুর ঘাটে যাই কদাচিৎ। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগেনা; মাথা ঝিমঝিম করে শুধু; শরীরে মনে দারুন অবসাদ; আমার জীবনে বুঝি শীত এল। শুধু বিকেলে নমুর সঙ্গে বেশী সময় কাটাই আজকাল; এই যা ভাল লাগে। আশ্চর্য দ্রুতগতিতে শিখছে নমু, ওকে বেহালা শিখিয়ে আশ মেটেনা আমার। বাকি সময় নিস্তেজ খিটখিটে-মেজাজে নিঃসঙ্গ বুড়োর মত বিছানায় শুয়ে থাকি। ভাল লাগে। ...সারা দিনরাতে নমুর সাথে বিকেলে বেহালা বাজানো, আমার এই একমাত্র আনন্দেও বাধা পড়ল। জ্বরে পড়ল নমু। সাতদিন হল, জ্বর ছাড়ল না। শীত এগিয়ে আসছে। আরো দু'দিন পরে বিকেলের চা নিয়ে এলো আজ বন্দনা,

—জানেন, নমুর বোধ হয় টাইফয়েড হয়েছে।

—এঁ্যা? নিস্তেজ চোখ তুলে ওর মুখে তাকাই। কিছুতে উৎসাহ নেই; কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। শীত লেগেছে জীবনে। চুরুকের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে আমার জীবনতরী ভেঙে গেল বুঝি। নির্জীব দেহ মন। একি হল আমার!...

—হুঁ, দিদিকেও আজ বাবা তার করেছেন! দুশ্চিন্তায় ছলোছলো চোখ নিয়ে চলে যায় বন্দনা।

বাইরের আকাশে চাঁপারবরণ মিষ্টি বিকেলি রোদ। কিছু ভাল লাগে না আমার। কী যে হল। ঝিম ঝিম করছে মাথা। বিছানায় শুয়ে রইলাম। নমুকে দেখতে যাবনা? অসুখ হওয়ার পরে আর দেখিনি ওকে,—এক বাড়ীতে থেকেও। থাক্, কিছু ভাল লাগে না আমার। বেহালা বাজাতেও না। ভাবি সাপের মত খোলস ছেড়ে নতুন সাজ নিয়ে বাঁচতে হবে আমাকে। ঝিমালে চলবে নাতো…

পরদিন সকালের গাড়ীতে এল নন্দিনী। চা খেয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম। বাড়ীতে সাড়া পড়ল। দোতলার সিঁড়িতে ওর পায়ের পরিচিত শব্দ শুনি আমি। খানিক পরে আবার। শব্দ কাছে আসছে এবার।

—রবীন! দরজায় পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল নন্দিনী। তেমনি ফুটন্ত, তাজা উজ্জ্বল, যৌবনোচ্ছল, মাদকতা মাখা। সেই নন্দিনী।

—শুয়ে আছো! অবাক চাউনিতে সে আমার মুখে খুটিয়ে দেখল। দাঁড়াল বিছানার পাশ ঘেঁসে —সুরভি ছড়িয়ে।

—তোমার শরীর খারাপ, রবীন? গভীর মমতায় তার গরম হাতখানি আমার কপালে রাখল। চশমার আড়ালে তার দুই নীল অতলান্ত চোখে আমার জন্যে স্নেহ সহানুভূতি মমতা উৎকণ্ঠা উথলে উঠল। আমি তেমনি শুয়ে,

—ভাল লাগে না নন্দিনী। কিছু ভালো লাগে না। কী যে হয়েছে; ভালো আছো?

—হুঁ! ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। কী মিষ্টি ওর গলার সুর। কী চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। কে বলবে সে সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে এল। বহুদিন পরে আমার নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা বুকে উত্তাল রক্তস্রোত জেগে উঠল, ওর চোখে তাকিয়ে হাসলাম। আমন্ত্রণ মুখর হাসি—

—রবীন! তুমি নাকি নমুকে দেখতে যাওনি একটিবার! নন্দিনীর চোখে অভিমানের ছায়া পড়ল।—তোমার ছাত্রী, তোমাকে এতো শ্রদ্ধা করে, একই বাড়ীতে রয়েছো! কৃতজ্ঞতা ভদ্রতা বলেও তো কিছু আছে!

—আমি ভদ্রসমাজের বাইরে, নন্দিনী। তোমাদের হাজার রকমের মরচে পড়া সুন্দর ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায়না, তাইতো খ্যাপার মত এখানে, ওখানে

ছুটে বেড়াই। আমাকে বোঝেনা কেউ, আমার সৃষ্টির জ্বালা—

পায়চারি থামিয়ে আমার মুখোমুখি বিছানা ঘেঁসে দাঁড়ায় সে। ঝলসে ওঠে প্রতিবাদে:—তুমি এমনিতেই বিরাট শিল্পী, রবীন! আর বড় বড় সৈনিকের মত বুলি আউড়ে বড় হতে হবেনা! হঠাৎ সুর বদলে গেল তার, করুণ ছায়া নেমে এল উজ্জ্বল মুখে,—মা তো থেকেও নেই। আমাদের আটবোনের সবার ছোট এই নমু। হয়তো বাঁচবেইনা এবার। তোমার দয়ামায়াও নেই রবীন?

—আমার কি হয়ে গেছে নন্দিনী। মনের আনন্দ মুছে গেছে। শুধু ঝিমোতে ভালবাসি—

চট করে শাড়ির তলা থেকে স্টেথোসকোপ্ বের করল নন্দিনী,

—এসো, একটু পরীক্ষা করে দেখি!...

আমি তেমনি শুয়ে শুয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাই ওর দিকে। নন্দিনীর সুবাসিত জ্বালা-ধরানো তনুদেহ ধীরে ধীরে আমার বুকের উপর নেমে আসে শান্ত পাহাড়ের বুকে দুরন্ত মেঘের মত। মনে হয় যেন অন্ধকার দিশাহারা রাহু গ্রাস করতে আসছে আমাকে। আরো ঝুঁকে পড়ছে ওই মাদকতায় পরিপূর্ণ ঢলো ঢলো লাবণ্যের অপরূপ দেহলতা, কাছে,—আমার বুকের আরও কাছে। এইতো আমার মুখে ওর আগুনঝরা নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারি। নন্দিনী আমার সার্ট তুলে ধরে বুকে ওর যন্ত্র বসালো। ওর মাংসল আঙুলের ছোঁয়ায় যেন বুক জ্বলে গেল আমার। হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত প্রচণ্ড লাফ দিয়ে উঠে বসলাম আমি। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম খ্যাপার মতন,

—সরে দাঁড়াও বলছি। বি অফ্!

ভয়ানক চমকে পিছিয়ে গেল নন্দিনী, চশমার কাঁচ ঠেলে যেন তার দুই নীল চোখ বেরিয়ে আসবে। প্রায় কাঁপতে শুরু করে সে। নিদারুণ অপমানে অসহায় ভঙ্গীতে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল নন্দিনী।

—ছিঃ রবীন। পাগল হলে?—

পাগল! পাগল! বুক জ্বলে গেল আমার ওর আঙুলের ছোঁয়ায়! দুহাতে পাগলের মত আমি বুক বুলিয়ে ওর চোখে চোখ রাখলাম,

—সাবধান বলে রাখছি, আর কোন দিন ছোঁবেনা আমাকে—

আশ্চর্য মেয়ে নন্দিনী। সামলে নিয়েছে নিজেকে সম্রাজ্ঞীর সদম্ভ-মহিমায়।

আবার যন্ত্রটা শাড়ির তলায় লুকিয়ে স্থির নিষ্কম্প মশালের শিখার মত দাঁড়িয়ে আছে আমার মুখোমুখি। তেমনি গর্বোন্নত বুক, আত্মগরিমায় প্রদীপ্ত দুই চোখ।

—কেন, আমি কি অচ্ছ্যুৎ?

—তার চেয়েও খারাপ। তোমার ছোঁয়ায় জাত যায়না, কিন্তু আমার কাণ্ডজ্ঞান যায়। আর একদিন সেন্টিমেণ্টাল হয়েছিলাম মনে আছে? কেঁদে-ছিলাম তোমার কোলে মুখ রেখে—

—আবার যদি তেমনি হও রবীন! নন্দিনী অদ্ভুত মিষ্টি ভঙ্গীতে হাসল, স্থির দাঁড়িয়ে বলল,—তাহলে ধন্য মনে করবো নিজেকে।

—মাপ করো নন্দিনী। তোমাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও চাইনি, স্বপ্নেও নয়। তোমার ছোঁয়া যেন আমার শরীরে, মনে, বিবেকবুদ্ধিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তুমি ছুঁয়োনা আমাকে! সাবধান···

—আগুন লাগলই বা! তেমনি আশ্চর্য সুন্দর হাসি তার রক্তাভ ঠোটের কোনে। —চলি রবীন, যদি কোনদিন শুনি পাগল হয়েছো, দুঃখিত হবো, বিস্মিত হবোনা!

—ধন্যবাদ, নন্দিনী···

নন্দিনী চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে এলাম। নমুর ঘরে ওরা তিন বোন একটা সোফায় বসে আছে চুপচাপ। পর্দা তুলে ধরতেই নন্দিনী মাথা নাড়ল।

পশ্চিমের জানালা খোলা। নীল পর্দার ওপারে শান্তকোমল আকাশ। নমুর মনের মত অনাবিল, সুন্দর, নিঃসঙ্গ, কল্পনায় রঙীন। জানালার পাশে খাট। ধবধবে বিছানায় শুয়ে নমু। চোখ বুজে শুয়ে আছে আমার মালশ্রী রাগিনীর শ্রীমতী নায়িকা। আঃ, যেন তুষার শুভ্র বিছানার চাদরে কোন বিরাট শিল্পী সূক্ষ্ম নিপুণ তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে এক সপ্তদশীর ছবি, এমনি ছায়ার মত অগভীর কায়া তার। আহা—

আরো সাদা হয়ে গেছে মোমের পুতুল, হিমালয়ের নিষ্কলঙ্ক বরফের মত সাদা। অস্বাভাবিক বড় চোখ দুটি বোজা। পাতলা ঠোঁট দুটি বিবর্ণ। আজ আর বেণী বাঁধা নয়। মুক্ত অলকানন্দার মত রুক্ষ চুলের স্রোত মাথার দু'পাশে সাদা বালিশ বেয়ে নেমে এসেছে। বেঁচে আছে নমু? আঃ, ঐ যে ক্ষীণ

বুকটা কাপড়ের তলায় একটু কেঁপে উঠল। আমি ওর অপার্থিব মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারিনা। নন্দিনীর চাপা কণ্ঠের সুরে চমক ভাঙে আমার,

—বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। টেম্পারেচার কমেছে সকালবেলা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে তাকাল নমু। চোখাচোখি হল আমাদের। বিবর্ণ ঠোঁটের কোনে বুঝি একটু ভাঁজ পড়ল। হাসল বুঝি নমু। বিছানার উপর দু'হাত রেখে ওর মুখের 'পরে ঝুঁকে পড়লাম,

—ভাল আছ নমু? নমু, নমু!

বাতাস আর তেমনি চুপি চুপি শিস্ দিয়ে উঠলনা কানের কাছে মিষ্টি সুরে। ঠোঁট নাড়ল নমু, শব্দ বেরোল না। ঠোঁটের কোনে মলিন হাসির ভাঁজ পড়ল, চোখ দুটি কথা কয়ে উঠল। ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিলাম,

—তুমি ভাল হয়ে উঠবে নমু, শীগগির ভাল হয়ে উঠবে—

—ভাল! মাস্টারবাবু! যেন কোন অশরীরী আত্মা বাতাসের মত কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল। চমকে উঠলাম। নন্দিনী এসে পিছনে দাঁড়াল,

—আর নয় রবীন। এবার এসো—

সরে এলাম। বিষম শান্তিতে চোখ বুজল নমু।

নীচে নেমে এলাম। শুয়ে রইলাম। বড় ক্লান্তি। ঝিমঝিম করছে মাথা। শরীর যেন দুঃসহ বোঝা। কী যে হল আমার···

একুশ দিন পর। নমু ভুগছে। আমার ভাল লাগেনা কিছু। বাইরে যেতে চায়না শরীর মন, শুধু ঝিমোতে চায়।

সন্ধ্যের পরই হঠাৎ শুরু হল ত্রস্ত আনাগোনা, সন্ত্রস্ত ফিসফাস। নমু কি মারা যাচ্ছে? আমি তেমনি বিছানায় শুয়ে, আলোর বাল্‌বের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সিঁড়িতে অনেক পায়ের দ্রুত চলাফেরার শব্দ।

নমু! নমু! উঠে দাঁড়ালাম। মাথা ঘুরছে। না, যেতে হবে আমাকে, ক্লান্তিকে ব্যাধিকে হটিয়ে দেব আমি। দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। বারান্দায় মাথা নুইয়ে দীর্ঘকায় ডাক্তার সাহেব চুরুট টেনে পায়চারি করছেন, একহাতে চাপদাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। চোখ তুলে তাকালেন একবার। জ্বলছে যেন মর্মভেদী দৃষ্টিভরা দুটি চোখ।

—ইয়ংম্যান্, বি প্রিপেয়ার্ড ফর দি ওয়ার্স্ট। যাও ভিতরে যাও! তোমার ছাত্রীকে দেখো···

নন্দিনী বন্দনা চন্দনা নমুর শিয়রে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে স্থির প্রতিমার মত। জানালার ধারে আধবুড়ো ডাক্তার প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে তাকাচ্ছেন নমুর মুখে। চোখে নিষ্ফল প্রয়াসের নিস্তেজ বেদনার্ত দৃষ্টি। আরো দু'জন ভদ্র মহিলা ও একজন প্রৌঢ় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

আর নমু! আঃ, কে এমন সর্বনাশ করলে। নমুর মাথার কালো স্বচ্ছন্দ অলকানন্দার স্রোত নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে দস্যুর দল। নেড়া মাথায় বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে। কঙ্কালের উপর যেম সাদা কাগজ মুড়ে রেখেছে কেউ। চোখ বুজে পড়ে আছে নমু। যমদূতের গাড়ী লেট্ হচ্ছে কেন বুঝতে পারি না। নমুর প্রাণ মহাযাত্রার পথে পা ছোঁয়ায় না কেন? আমি যে আর তাকাতে পারছি না...

নমু! নমু! নমু! কান্না! কান্না! কান্না! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো আমার বুকের আলোড়ন, নমু?

সেই ডিসেম্বরের রাতে ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমার পাশের সোফায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বসেছিলেন ডাক্তার সাহেব। ঘরে লোকজন আরো বেড়েছে। হঠাৎ আধবুড়ো ডাক্তারটি উঠে এলেন নমুর বিছানার পাশ থেকে, ডাক্তার সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাতটা তুললেন,

—সরি! ওভার!

—ওভার! তড়িতাহতের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সাহবে।

—রবীন, একটু এসো! ঘরের ভিতরের আলোড়ন উপেক্ষা করে আমার হাত ধরে ডাক্তার সাহেব বাইরে এলেন, সিঁড়ির মাথায় উজ্জ্বল বাতির নীচে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ধীরে সুস্থে একটা চুরুট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে রাখলেন, পরিপাটি করে দেশলাই কাঠি দিয়ে চুরুট ধরিয়ে নিবন্ত কাঠিটা অবহেলায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে এক মুখ নীল ধোঁয়া ছাড়লেন। অন্য দিনের মতই তার সেই নিষ্কম্প দরাজ গুরু-গভীর গলার স্বর জেগে উঠল, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই,

—রবীন, রাজেনের কাছে যাও!

—এ্যাঁ? স্বপ্নাবিষ্টের মত আমার পা নড়তে চায় না যেন। নমুর ঘর থেকে চাপা গোঙানির শব্দ আসছে। আর বারান্দার প্রান্ততম ঘর থেকে এক নারী কণ্ঠের বুকভাঙ্গা বিলাপ।...কে? নমুর মাকে দেখিনি কোনদিন। কোন ভুল নেই। কাঁদছেন নমুর মা।

—মাই বয়! ডাক্তার সাহেবের ভারী গমগমে গলার স্বর। নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আড়াল থেকে বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন

—জলদি! রাজেনের কাছে যাও। তাকেই বড্ড দরকার এখন। শুধু খবরটা দিও, বলো, আমার নমু মা-মণি ঘুমিয়েছে। নমু ইজ নো মোর! বুঝলে?

নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাচ্ছে ডাক্তার সাহেবের দাড়ি গোঁফের নিবিড় জংগলে ঘেরা মুখের চারপাশে। সজোরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন ডাক্তার সাহেব,

—ইয়ং ম্যান্, মাই ডিয়ার—

পাগলা কুকুরের মত দিশাহারা দৌড় দিলাম আমি। ওরা কাঁদুক। নমুর মা কাঁদুক। হোটেলের ছোট্ট ঘরের দরজায় দুম্‌দাম্ ঘা দিচ্ছি আমি।

—রাজেন! রাজেন! তোমাকে ডাক্তার সাহেবের বড্ড দরকার ··

গঙ্গার তীরে চিতা সাজাচ্ছে ওরা। একটার পর একটা বিড়ি খাচ্ছে রাজেন। যেন অসুরের শক্তি এসেছে তার গায়ে। অনেক অচেনা মুখ ঘুরছে ফিরছে আমার আশে পাশে। ঘড়ির কাঁটা রাত দুটোর ওপারে। মেঘ জমেছে শীতের আকাশে।

নমু! নমু! নমু!

কী গভীর ব্যথা! আর কান্না! আর নিষ্ঠুর কর্তব্য!

—সাবাস মাস্টার!

সাবাস নমু, সাবাস তোমায়! এমনি করে তুমি ছাই হয়ে গেলে, নমু। মুছে গেলে সবুজ সজল আলোয় খুসীতে প্রেমে গানে মায়াময় সুরেলা পৃথিবী থেকে, আমার প্রেমের ধরিত্রী থেকে! তোমার মত আমি মরতে পারবনা যে, নমু! কোন দিন না! আমার এই প্রেমের পৃথিবী ছেড়ে কোথায় যাব আমি! ওকে যে বড় ভালবাসি!

মেঘ কেটে গেছে। পুব আকাশে লাল রঙ ফুটে উঠবার অগেই আমরা সবাই ফিরে এলাম নমু! শুধু তুমি ছাড়া! নমু শুধু তুমি ছাড়া!!

কৃষ্ণাতিথির ঘোলাটে চাঁদ মায়াবী আলো ছড়াচ্ছে গঙ্গার চরে, গাছে আর ঝোপজংগলে। দপ দপ করে জলছে রাত্রিশেষের উজ্জল তারা। অতি ধীরে হেঁটে ফিরছি আমরা। বাকি সবাই অনেক এগিয়ে গেছে, পিছনে রাজেন চলেছে আমার পাশে পাশে, কথা বলছে অবিরাম। বিজাতীয় এক আক্রোশ ক্রমে দানা বাঁধছে আমার বুকে, ঐ নিন্দুক অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডটাকে চরম আঘাত হানবার জন্যে প্রতিহিংসার আগুন জেগে উঠল মনে।

চোখের সামনে শুধু ভাসছে কেমন হেসে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে রাজেন বাঁশের টুকরো দিয়ে নমুকে নিষ্ঠুর খোঁচা মারছিল! হাসছিল রাজেন! হাসছিল! ঐ নিন্দুকের ওপর কেমন করে প্রতিহিংসা নেব আমি!

রাজেনই সুযোগ করে দিল। গঙ্গার চর ছাড়িয়ে আম বাগানের কিনারে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা। জোনাকী জ্বলছে। শেয়াল চেঁচাচ্ছে। বক বক করতে করতে এক সময় সন্তর্পনে রাজেন শুধালেন,

—নন্দিনী কবে কোলকাতায় ফিরছে, মাস্টার?

—সে খবরে তোমার কাজ কিসের, রাজেন দা?

—বারে! ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল সে,—পরীক্ষার আগে এই ধকল, দুঃখ। এবার তো আর এখানে থেকে—মানে,…অবশ্যি সে অসাধারণ মেয়ে, সামলে নেবে। শীগগিরই চলে যাবে, তাই না?

—কেন? প্রথম অস্ত্রটা ছাড়লাম। বুকে কান্না, চোখে বিষাদ। মুখ ফুটে কথা বেরোয় না। কিন্তু আর সময় পাব নাতো আমি, এই শেষ সুযোগ। বললাম,—ও চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওর সম্বন্ধে কেচ্ছাটেচ্ছা বলে বেড়াতে অসুবিধা হচ্ছে বুঝি? তুমি তো স্পষ্টবাদী বলেই জানতাম, রাজেনদা! তবে ভয়টা কিসের?

—মানে? সহসা বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল রাজেন, আমার মুখোমুখি। ফিকে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে তার দুই চোখ। কাঁপা গলায় বলল রাজেন,

—মানে, আমি শুধু নিন্দা করেই বেড়াই, তাই না? ব্রুট! আচ্ছা? আমি নিন্দুক! বেশ, চুরি না করেই যদি চোর হলাম, তবে এবার দেখে নেবো। …সে সীমাহীন আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, জোরে শ্বাস টানল, —আচ্ছা, তবে এবার শহরে বলেই বেড়াব নন্দিনীর সব কেচ্ছা, তোমার কাণ্ড! দরকার হয় হোটেল ছাড়ব, তাও আচ্ছা!

—আচ্ছা? এবার চরম অস্ত্র। ওর পাশ কাটিয়ে পা বাড়িয়ে চড়া গলায় বলে উঠলাম,—তাহলে তোমার কেচ্ছাও শহরে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হবেনা, রাজেনদা। নন্দিনী বলেছে তোমার বিমলার কেচ্ছা!

—হোয়াট্! বাজপাখির মত বীভৎস গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, বিরাট দুই থাবা দিয়ে আমার পাতলা দুই কাঁধ চেপে ধরল। আমার মুখে ওর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে।

—কী জান তুমি বিমলার কথা? ভাল চাও তো বলে ফেল, রবীন!

পশুর মত ফোঁস ফোঁস করছে রাজেন। কান্না-উথলানো বুকে শান্তি আসছে আমার। প্রতিহিংসা নয়, প্রতিহিংসা!

—বিমলার কথা! কাঁধ ভেঙে দিচ্ছে আমার রাজেন, আক্রোশে ঝাঁকুনি দিচ্ছে; বিস্ফারিত চোখে তাকাচ্ছে আমার মুখে। হাসলাম, নিষ্ঠুর কসাইর মত। —অসহায় বিধবা মেয়ে, তাকে বাগে পেয়ে ভুলিয়ে চরম সর্বনাশ— ছিঃ ছিঃ—

—বদমাস্! স্কাউণ্ড্রেল! নিমেষে আমার সার্টের কলার বাঁ হাতে চেপে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে লাগল রাজেন। কেউ নেই আশে পাশে। শুধু নীল আকাশে কয়েকটি ভোরের দপ্ দপ তারা, জোনাকি, হিমেল হাওয়া। আমার পাতলা শরীর কেঁপে উঠল। ডান হাতে কপালের উপর ঘুষি বসাল রাজেন, এরপর মুখে, নাকে, চোয়ালে। —মিছে কথা, মিছে, সব মিছে! শয়তান—

মুখ থুবড়ে পাশের নোংরা নালায় পড়ে রইলাম আমি জ্ঞান হারার মতন।

কতক্ষণ এমনি পড়েছিলাম বলতে পারিনা। চোখ মেলে দেখি নালায় পড়ে আছি। মাথা তুললাম। পূবের আকাশে লাল ছোপ। মাথার উপরেই গাছে ডানা ঝাটপটিয়ে পাখিরা ডেকে উঠল। কেউ নেই। আমি পড়েই রইলাম। দেখি দূর রাস্তা ধরে আবছা মূর্তি এগিয়ে আসছে এদিকে। আরও কাছে এলো। মোটা বেঁটে—রাজেন?

—মাস্টার! মাস্টার! শঙ্কিত দরদী সুরে ডেকে উঠে আমার মাথা টেনে তুলল সে, কান্নাভরা সুরে আর্তনাদ করে উঠল,—মাপ কর ভাই! ছোট ভাই-এর মতন দেখি তোকে, মাপ কর! মাথার ঠিক ছিলনারে—

আমায় দাঁড় করাল রাজেন, তার ধুতির খুঁটে মুখ, মাথায় রক্ত মুছে দিল। কঁকিয়ে উঠল, —খুন চেপেছিল মাথায়, মেরেই ফেলতাম তোমাকে। অনেকদূর দৌড়ে গিয়ে তারপর ঠাণ্ডা হল মাথা—মাপ করেছিস ভাই?

মুখ মাথা ব্যথায় টন্‌টন্ করছে, তবু হাঁটতে পারছি। রাজেন প্রায় টেনে নিয়ে চলেছে আমায়। আর আর্তনাদ করছে,—কেন অমন কথা বলতে গেলে ভাই, কেন হতভাগার দুর্বল জায়গায় আঘাত করলি, এ্যাঁ? আমি যে কত বড় দুর্ভাগা!

—তাই নাকি? ক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠলাম তার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

—নয়তো কি! মা বাবা জন্ম দিয়েই খালাস। চিরকাল পরের ঘরে ঘুর ঘুর

শুনে শুনে বড় হলাম। ভগবান কোন গুণ দেননি, না বিদ্যা, না বুদ্ধি। সবার মুখে ছোটবেলা থেকে আমার নিন্দা শুনতে শুনতে আমিই নিন্দুক হয়ে পড়লাম, মাস্টার। আমি নিন্দুক, আমি পাপী! নইলে দেবতুল্য ডাক্তার সাহেবের নামে নিন্দা রটিয়ে বেড়াই দিনেরাতে, ওর দয়ায় খেয়ে পরে? ভাইরে, এ যে আমার মজ্জায় মিশে গেছে। সব বুঝি মাস্টার, সব বুঝি, তবু নিন্দা না করে থাকতে পারি না। স্বভাব, স্বভাব! বিধাতার অভিশাপ, আমি কি করবো, বলো মাস্টার?

—তাই নাকি? ভোর হয় হয়। আমরা হাঁটিতে থাকি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর কোন নেশা নেই আমার, মাস্টার। নেশা ছাড়া বাঁচেনা মানুষ। পরনিন্দাই আমার একমাত্র নেশা। কি করবো ভাই? রাজেন হাঁপায়, ভিখীরির মত একটানা আর্তনাদ করে চলে, – সবাই জানে আমার নেশার কথা, তাইতো কেউ আমার কোন কথা বিশ্বাস করেনা। তাই বিমলার কথাও বিশ্বাস করলো নারে ভাই—

রাজেন বলে গেল। সংসারে ওর একমাত্র আপনজন ছিল বিমলা, জেঠতুতো বড় বোন। বিয়ে হল গ্রামের এক নেশাখোর দোকানীর সাথে। হঠাৎ বছর দুই আগে রাজেন তাকে দেখতে পায় কলকাতায় পাশে পথে পথে ভিক্ষে করছে। কালা-বোবা হয়ে গেছে সুন্দরী বিমলা—ভরা যৌবন তার শরীরে, চোখে বিদ্যুৎ। এমন ভিখীরিকে সবাই কৃপাকণায় কৃতার্থ করতে উন্মুখ। অনেক কষ্টে রাজেন তাকে এখানে নিয়ে এলো। কোন কিছু জানাতে পারল না নিরক্ষর মেয়েটি। পাকিস্তানে ওর শ্বশুর বাড়িতেও কারও খোঁজ পাওয়া গেলনা। এদিকে সবাই কুৎসিত কথাবার্তা শুরু করল। ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল সে অন্তঃসত্ত্বা। সবাই পুলিশ লাগাল রাজেনের পিছনে, ধরে নিয়ে গেল তাকে, মারল; তার কোনো কথা বিশ্বাস করলনা কেউ—শুধু ডাক্তার সাহেব ছাড়া। তিনি বিমলাকে পাঠিয়ে দিলেন অনাথ আশ্রমে, রাজেনকে আশ্রয় দিলেন তার হোটেলে। ···রাজেনের হাতে চাপ দিলাম,

—আমি বিশ্বাস করলাম, রাজেনদা। মিছি-মিছি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি, রাগ করোনা! হ্যাঁ, আমি আজই চলে যাচ্ছি। কোথায়, জানতে চেয়োনা—

—সত্যি? যাও ভাই, তুমি বড় হবে একদিন, আমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু আমার মত নিন্দুকের ব্যথার কথাটা যে বিশ্বাস করেছিলে, তা কোনোদিনই ভুলবো না মাস্টার। বুঝলে?

রাজেন কী সব বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কান না দিয়ে জোরে পা চালালাম আমি একবারও ফিরে না তাকিয়ে।

বাড়ী ফিরতে ভোর হয়ে গেল। স্নান সেরে জামা পরছি, দরজার বাইরে থেকে চাকরটা জানালে,—উপরে চা তৈরী···

কৃষ্ণচূড়া গাছের চূড়া ডিঙিয়ে সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ দোতালার বারান্দায় লুটিয়ে পড়েছে। সেই আলোয় সোফা পেতে ওরা বসেছে। ডাক্তার সাহেব আর তিন মেয়ে। বন্দনা চন্দনার মুখ চোখ লাল, ফোলাফোলা। শুধু গর্বোদ্ধত মাথা তুলে পিতাপুত্রী তাকাচ্চেন নবজাতক সূর্যের দিকে। কাঁচের আড়ালে নন্দিনীর নীলচোখ দুটো একটু যেন স্তিমিত, আর কিছু নয়। তেমনি ভোরের গোলাপের মত তাজা সুরভিত মুখ নন্দিনীর,

—বসো রবীন। সে বললে। টি-পট থেকে চা ঢেলে বন্দনা চন্দনার সামনে ধরল। —নে, চা খেয়ে একটু ঘুমোগে যা!

ডাক্তার সাহেব চায়ে চুমুক দিচ্চেন আর নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়াচ্ছেন। কৃষ্ণচূড়ার ডালে একপাল পাখী এসে কিচিরমিচির শুরু করল। সবাই নীরব। শুধু শেষ প্রান্তের ঘর থেকে নমুর মায়ের শ্রান্তিভরা বিলাপের করুণ স্তিমিত সুর ভেসে আসে মাঝে মাঝে। বন্দনা চন্দনা তাড়াতাড়ি চা শেষ করে চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে।

—তোমার মুখে ও কিসের দাগ, রবীন? ডাক্তার সাহেব চোখ কুঁচকালেন। —চোখটা ফুলে উঠেছে; দেখেছো নন্দা?

—ও কিছু নয়। হোঁচট খেয়ে নালায় পড়ে গিয়েছিলাম। রাজেন ছিল পাশেই, নয়তো আরও চোট লাগতো।

—আই সী! তিনি মাথা নাড়লেন। —আই বিলিভ ইউ, নন্দা এখনি ওষুধ লাগিয়ে দাও। বুঝলে?

—হ্যাঁ, বাবা। নন্দিনী আমার মুখে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার।

চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে ডাক্তার সাহেবের জমকালো মুখের দিকে তাকালাম। চোখ ফেরালেন তিনি,

—ইয়েস, মাই বয়!

—একটা কথা বলবো! ···যেন নমুর মত বাতাসের শিস বেরোল আমার গলা চিরে।

—বলো, বলো! ধোঁয়ায় যেন গোটা পৃথিবী ছেয়ে ফেলতে চান তিনি। নন্দিনী সোজা হয়ে বসেছে, তাকাচ্চে আমার দিকে। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে চলি আমি।

—আমি চলে যেতে চাই, আমি! ···আর কথা শেষ করতে পারিনা, নীচে তাকাই।

—কেন রবীন?

—নমু নেই, আর তো আমার থাকার প্রয়োজন নেই···

—ওঃ এই কথা? যেন আশ্বস্ত হলেন তিনি। —কেন, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার এখানে, যতদিন খুশী, আজীবন। বিয়িং ফ্র্যাংক, ইয়ংম্যান, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসি!

বারান্দার শেষ কোণা থেকে শ্রান্ত লয়ে ভেসে আসছে আমার অদেখা নমুর মায়ের ফুলে ফুলে কান্না। বিলাপ।

—সে আমি জানি। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কিন্তু ভাল লাগছে না আর!

—দ্যাটস্ রাইট্! যেন খুশী হয়ে উঠলেন তিনি,—নমু মা-মণি নেই, শান্তি পাচ্ছ না। তা বেশ, ঘুরে এসো। কোথায় যাবে রবীন?

—আসামের কোনো পাহাড়ে।

—চমৎকার, রবীন! চমৎকার! ঠিক ধরেছো, শান্তি পাবার এই একমাত্র জায়গা পৃথিবীতে—পর্বতে! যে কোন সবুজ নির্জন পাহাড়ে! ডাক্তার সাহেব বলে উঠলেন,—টাকার জন্যে আর মেয়েদের সুবিধার জন্যে শুধু এখানে দেহ পড়ে আছে আমার, মন আমার রয়েছে হিমালয়ে। আমিও এবার যাব। স্নো-মেন্ আবিষ্কার করা চাই-ই আমার! আই মাস্ট বি দি ফার্স্ট মেন্ টু কেচ্ হিম্!

চঞ্চল হয়ে উঠেছে নন্দিনী। আমি বলে উঠলাম,

—কিন্তু আমার ভাড়ার টাকাতো নেই!

—এ্যা! আঁৎকে উঠলেন যেন ডাক্তার সাহেব,—মহা অন্যায় হয়ে গেল! মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।—তোমাকে একটি পয়সাও দিইনি, না রবীন?

—আমি না চাইলে দেবেন কেমন করে? এবারে দেবেন। ভাড়ার টাকাটা হলেই চলবে···

—নন্দা, দেখো রবীনকে যেন কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়। বুঝলে?

নন্দিনী মাথা নাড়ে। এতোক্ষণে মুখ খোলে,

—কবে যাবে তুমি?

ওর চোখে চোখে তাকালাম।—আজই; বিকেলে। স্টীমার ঘাটে চলে যাব, রাতটা স্টীমারে কাটবে। কাল ভোরে ওপারে রেল ইষ্টিশানে যাবে স্টীমার!

—আজই? একটু অবাক হলেন ডাক্তার সাহেব।—বেশ, তুমি যখন শান্তি পাচ্ছ না, আজই যাও। মনে রেখো রবীন, আমার বাড়ী সব সময় তোমার কাছে খোলা রইল, সঙ্কোচ করো না, কোনদিন যদি,—মানে…শেষ করতে পারেন না তিনি।

বুঝেছি। কী আর বলবো! উঠে গিয়ে তাকে প্রণাম করলাম শুধু। প্রথম ও শেষ প্রণাম।

—বসো রবীন। একটু হোটেল থেকে ঘুরে আসি,—সুদীর্ঘ শরীরটাকে টেনে তুললেন ডাক্তার সাহেব, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

নন্দিনী আর আমি এবার মুখোমুখি। চোখাচোখি হল আমাদের। স্নান নীরস গলায় কথা বলল সে,

—আর পাগলামি করো না রবীন। জীবনটাকে আর ক্ষতবিক্ষত করে বাজে খরচ করো না। আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো—

—কলকাতায়? কেন নন্দিনী? আমার তো টাকার প্রয়োজন নেই।

—টাকা! মাথা তুলে চিবুক টান করে তাকাল নন্দিনী,—বনে পাহাড়ে মরবার জন্যে নয় তোমার জীবন। তোমাকেও বাবার রোগে পেয়েছে। পাহাড়ের ভূতে পেয়েছে। আর ঐ বাজে 'বি ক্র্যাংক্!' বাবার প্রভাবে চলছো তুমি আজকাল। জানো রবীন, ভেবে দেখো তোমার প্রতিভার কী দশা করছো তুমি? কলকাতায় চলো,—নাম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সার্থকতা…

—জানি, জানি! অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি আমি।—আমি ভিখারি নই, বুঝলে? টাকা আর প্রতিপত্তির জন্যে কলকাতার রাস্তায় ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়ানোকে কি যে ঘৃণা করি, যদি জানতে! শুধু আত্মপ্রচার! যার নিজের শক্তির উপর যত বেশী অবিশ্বাস, সে-ই তত বেশী আত্মপ্রচার করে বেড়ায়।

—তবে তুমি কী চাও?

—শান্তি। নিরালায় নির্বিঘ্নে আমার সাধনা চালাতে চাই। আর কিছু নয়। যে সুর আমার মন ছুঁয়ে যায়, ধরা দেয় না, তাকে আবিষ্কার করতে চাই।

—সেও এক তুষার-মানব। আজগুবি…

নিঃশব্দে আমার দিকে পলকহীন চোখ রেখে সোজা হয়ে বসে রইল সে।

হঠাৎ আস্তে টেবিলে চাপড় দিল, পেয়ালার ঠুং ঠাং শব্দ জাগল। চাপা গলায় বলে উঠল সে,

—তোমার পাগলামি আর সহ্য করবো না, রবীন। তোমাকে যেতেই হবে কলকাতায়। আমার আদেশ, মনে রেখো! তুমি আমার সঙ্গেই যাচ্ছো! তোমার ভুলপথ আর খ্যাপামি বদলাতে হবে এবার, রবীন!

আমায় ভোলাতে চেয়ো না, নন্দিনী। আমি নিরালায় শান্তিতে থাকতে চাই।

—নিরালায়? বিদ্রূপে ঝংকার দিয়ে উঠল গরবিনী রাণী,—মানে আত্ম-গোপন করে থাকতে চাও ভীরু কাপুরুষের মত। আচ্ছা রবীন, সমুদ্রের অতল গভীরে সোনার খনি থাকার সার্থকতা কোথায় বলতে পার? কলকাতায় আছে একজন: রাত দুপুরে বৃষ্টি থামলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বেহালা নিয়ে মাঝে মাঝে, পিছনে ছুটে চলে সুরমুগ্ধ জনতা, পথের দুপাশে জানালা খুলে যায়। আপন মনে বেহালা বাজিয়ে চলে পাগলটা—অপরূপ। কিন্তু কোথায় সার্থকতা? সে যে অন্যের ইচ্ছার ধার ধারে না। স্বাধীনতা আর পাগলামি এক নয়তো। তোমাকে নিয়েও আমার সেই ভয়, রবীন!

একটু হাসলাম। ম্লান। ক্লান্ত।—আমার জীবনের চরম সত্যটি হচ্ছে: আমি স্বাধীন। কারো ইচ্ছার চাকায় আমার জীবন বাঁধা নয়। সুতরাং… আমি দুঃখিত।

উঠে দাঁড়ালাম। বড় ক্লান্ত। আমার ঘুমানো দরকার।

ওর দিকে না তাকিয়ে সিঁড়িতে পা দিলাম।

সারা দুপুর ঘুমিয়েছি। বিকেলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ডাক্তার সাহেব কোথায় গেছেন।

—চলি, বন্দনা, চন্দনা!

ওরা আজ হঠাৎ মেঝেতে লুটিয়ে প্রণাম করে বসল আমায়। নন্দিনী আমার পিছু পিছু নীরবে নেমে এল। ঘরে ঢুকলাম।

একতাড়া নোট আমার সামনে তুলে ধরল সে। নীরব। নিস্পন্দ। সে কত টাকা? একশো, পাঁচশো, হাজার? আলগোছে তাড়ার উপর থেকে চারখানা দশ টাকার নোট তুলে নিলাম আমি।

—এইমাত্র? ছিঃ রবীন। আবার নিবন্ত মশালের শিখা ঝলসে উঠল

যেন। নন্দিনী আমার পকেটে গুঁজে দিতে চাইল নোটের তাড়াটা—আমি ছিটকে সরে গেলাম।

—যাবার সময় ছেলেমানুষি করো না, নন্দিনী।

—মাত্র চল্লিশ টাকা! আসামের পাহাড়ে কে আছে তোমার? উপোস করে মরবে যে রবীন! নন্দিনীর চোখেমুখে অকৃত্রিম শঙ্কা ও আতঙ্ক ঘনিয়ে এলো।

—প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেওয়াকে মুনাফা বলি আমি, নন্দিনী। এতেই ভাড়া মিটে যাবে আমার আশা করছি। আর, এই শহরেই কেই বা আমার আপন জন ছিল? সেখানেও কারা অপেক্ষায় আছে, কে বলতে পারে নন্দিনী?

বেহালার বাক্সটা ও ব্যাগ তুলে নিলাম আমি। হঠাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেল চিরকালের গর্বোদ্ধত রাজ-নন্দিনী। তার সম্রাজ্ঞীর আত্মগরিমা, তার প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সব ডুবে গেল নিঃসকোচ আত্মাহুতিতে, ভাগ্যের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করল সে। ছুটে এসে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরল, কাঁচের আড়ালে দুইচোখ বেয়ে তার ধারা নামল। তাজা গোলাপের মত মুখখানি তার কান্নায় ভেসে যাচ্ছে, থর থরিয়ে কেঁপে উঠছে নন্দিনী। হাতে একতাড়া নোট তখনো। অবরুদ্ধ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে সে। ভিখারিনীর মিনতি ঝরে পড়ল তার সুরে,

—দোহাই রবীন, আজ রাতটি থেকে যাও! আমি জানি, আর এ জীবনে দেখবো না তোমাকে! রবীন! রবীন!

...আজ সময় এসেছে। কাঁদুক নন্দিনী। মৃত্যুর অবরুদ্ধ গুমরে-ওঠা কান্না বাড়ি জুড়ে। নমুর ছায়া সব কিছুতে। আলগোছে ওর হাত ছাড়িয়ে বাইরে এলাম। দু'হাতে মুখ ঢেকে আত্মপ্রকাশের নিবিড় লজ্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নন্দিনী।

—বিদায় নন্দিনী! বিদায়! বিদায়! বাতাস আবার শিস দিয়ে উঠল আমার কণ্ঠে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও, নন্দিনী...

বাইরে লাল সুরকির পথে বিকেলের মিষ্টি আলো! পাহাড় ডাকছে আমাকে। পথে নামলাম।

দিন কয়েক পরে। সূর্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে সেই পাহাড়ী শহরে পৌঁছলুম। পাহাড়ের মাথায় দপ্‌দপ্‌ করছে সন্ধ্যাতারা। হোটেলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আধমরা হয়ে গেছি আমি। ভুল পথে হাঁটতে হাঁটতে শহরের নিরালা জনহীন প্রান্তে এসে পড়েছি। সার্টের ভিতর দিয়ে যেন বরফের সূচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে

অজস্র, দাঁত কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। চোয়াল দুটো জমে শক্ত হয়ে গেছে, মুখ নাড়তে পারিনা। রাস্তায় লোকজন নেই, শুধু কালো গাছে-ছাওয়া পীচঢালা পথের কিনারে বিজলী বাতি জ্বলছে প্রেতিনীর চোখের মত। মরণের মত নিষ্করুণ ঠাণ্ডা বাতাস। পায়ে শুধু একটা স্যাণ্ডেল। পায়ের পাতার কোন অনুভূতি নেই। পাথর হয়ে গেছি যেন। ভারী নিস্তেজ শুধু একটা জ্বালা। একটা পাথরে প্রচণ্ড হোঁচটে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কোনো ব্যথা নেই। অসাড়। নাক দিয়ে জল ঝরছে। জল মুছতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আঙুল কাঠ হয়ে গেছে। নাড়তে পারিনা। হায়, হায় কেন ইষ্টিশনে একটা কুলিকে নিলাম না। সে আমার মাল বয়ে একটা আশ্রমে নিয়ে যেতে পারত আজকে রাতের মত। নিষ্ঠুর তারাভরা আকাশ থেকে ঝরছে ঠাণ্ডা, মৃত্যুশীতল হিমধারা। ভয় হয়, পীচঢালা রাজপথে লুটিয়ে পড়ব, বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাবে আমার তাজা যৌবনের রক্তস্রোত। কোথায় মানুষ! একটা কুকুরও যে ডাকে না। পথ হারিয়ে এ কোথায় এলাম আমি। ঐ যে দূরে গাছের আড়ালে লাল আভা। ওকি! আগুন, আগুন, আগুন···

পা টানতে পারিনা। সারা শরীর অবশ, অসাড়। শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে এগোই। রক্তিম আভা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। শুনতে পাচ্ছি সুখী কণ্ঠের গানের সুর, টুং টাং তার যন্ত্রের মধুর সুরলহরী··

চারপাশে কাঠের বেড়া। খোলা গেটের ধারে বিরাট অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছে জন সাত আট লোক। বিলিতি সুরে অচেনা ভাষায় গান গাইছে গীটার বাজিয়ে। আঃ, লাল আগুনের সঞ্জীবনী স্পর্শ পেয়েছি এবার। প্রায় হুমড়ি খেয়ে আগুনের সামনে লুটিয়ে পড়লাম।

ভীষণ চমকে উঠল সবাই। গান স্তব্ধ হল। আমার বেহালার বাক্স, ব্যাগ ছিটকে পড়েছে। একজন আমার হাত ধরে মাটি থেকে তুলতে চাইল, আধা হিন্দীতে চেঁচিয়ে উঠল,—এঃ, বরফ হয়ে গেছে একেবারে! কি ঠাণ্ডা!

আঃ, আগুন! চোখ বুজে পড়ে রইলাম। চেতনা ফিরে আসছে ক্রমশঃ। ওরা আমার অজানা পাহাড়ী ভাষায় কথা বলছে, হাতে পায়ে আগুনের সেক দিয়ে মালিশ করছে ব্যস্ত হাতে। কিছু পরে আঙুল নাড়তে পারলাম, তারপর উঠে বসলাম। এতকাছে প্রাণদায়িনী লকলকে আগুনের শিখা। ডান হাতটা সোজা রক্তিম শিখার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। পুড়ে গেলনা হাত, শুধু লোম পোড়া গন্ধ বেরোল। ওরা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, আমি মুসাফির। বহুদূর থেকে এলাম। হোটেলের পথ দেখিয়ে দিতে পার?

—হোটেল? সে যে বহু দূর? ওরা বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

কাঠের কারখানা। অজস্র তক্তা আর নতুন তৈরী চেয়ার টেবিল চৌকি। গুঁড়া কাঠেরও রঙের সুবাস। গন্‌গনে আগুন। তালি দেওয়া প্যাণ্ট ওদের পরণে। মিস্ত্রী সবাই। শুধু আমার পানে চোরা চাউনি হানে তারা, আর নিজেদের মাঝে জোর আলোচনা চালায়। শেষে একটি লোক উঠে দাঁড়াল, মাথায় মোটা উলের টুপিটা টেনেটুনে পুবদিকে কাঠের স্তূপের পাশ কাটিয়ে মিলিয়ে গেল। কাঠের বেঞ্চে-বসা ফর্সা মতন ছেলেটা গীটারে সুর তুলল আবার,—টুং টাং ঝিম্ ঝিম্। মোটা ভরাট গলায় বিলিতি সুরে গান ধরল। সবাই পা ঠুকে তাল দিতে লাগল, শিস্ দিলে কেউ কেউ—আর থেকে থেকে তাদের কৌতুহলী দৃষ্টি এসে আটকা পড়তে থাকল আমার বেহালার বাক্সে…

আগুন, আগুন, মিষ্টি আগুন! তোমায় না পেলে সবুজ পৃথিবী ছাড়তে হত আজ আমায়। এমনি সঞ্জীবনী আগুন কত মানুষের বুক জুড়ে, তারই উত্তাপে আমি বেঁচে থাকবার, ভালবাসবার প্রেরণা পাই।… **Let me embrace you and feel the fire in your heart**…

মিনিট দশ পরে ফিরলো লোকটা। গান থামল। মোটা লোকটা আমার মুখের সামনে মুখ এনে ভাঙ্গা হিন্দীতে বললে,

—আমরা এই কারখানায় থাকি। কিন্তু বাবু তোমাকে ত এখানে রাখা চলবে না। পাশের বাড়ীতে আমাদের মালিক থাকেন, তোমাকে ডাকছেন। গোল সরলতা মাখা চোখ দুটি বেহালার বাক্সে ঠিকরে পড়ল; পানের রসে রাঙা জিব বের করে ঠোঁট চাটল লোকটি।

—চলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে আমার আগে আগে এগোয়। আবার বেজে উঠল গীটারের ঘুম পাড়ানি মধুর সুর। টুং টাং ঝিম্ ঝিম্ ঝম্।

গেট পেরিয়েই ছোট খাট একটা মাঠ। মাঝে মাঝে গাছ। মাঠের মাঝ-খানে লাল টিনে-ছাওয়া ছোট বাড়ী। বারান্দায় এসে লোকটা ফিসফিস করে উঠল,

—ওই ঘরে মালিক বসে আছে। ল্যায়ন সাহেব। লোকটা দরজায় টোকা দিল। —সাব, বাবুজী এসেছেন।

—ভিতর লেয়াও! যেন আলোকিত ঘরের ভিতর থেকে বাঘ গর্জে উঠল। টেনে কাঁচের দরজা খুলল লোকটা। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আঃ, কি আরাম, কি গরম গন্‌গনে কয়লার চিমনি জলছে এক কোণে। মধুর উষ্ণতায় ঘরের বাতাস মধুময় হয়ে উঠেছে। সেলাম করে লোকটা চলে গেল।

চিমনির আগুনের সামনে গদি আঁটা কাঠের চেয়ারে বসেছিল সে। লায়ন সাহেব। বিরাট জোয়ান পাঞ্জাবী। যেন বেঙ্গল টাইগার। টকটকে রঙ, মস্ত মাথা, দরাজ বুক। লালচে দাড়ি কামানো গাল। শাল প্রাংশু মহাভুজ। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। পরণে প্যাণ্ট, গায়ে উলের পুল-ওভার। নীরবে আমার চোখে চোখ রাখল সে। কী ভীষণ সম্মোহনী দৃষ্টি সে চোখে। বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। হাসিমুখে তার চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি। সেও তাকিয়ে। নিষ্পলক দু'জনে। নিথর, নির্বাক। হঠাৎ ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ঘাড় ফেরাল সে, বাঘের থাবার মত লম্বা শক্তিশালী হাতটা বাড়িয়ে টেবিলের উপর রেডিওর চাবিটা ঘুরিয়ে দিল।

বিলিতি অর্কেস্ট্রার সুরতরঙ্গে ঘরের গরম বাতাস ছেয়ে গেল। যেন চাপা হাড়ির ভিতর থেকে শব্দ বের হল। ইংরিজিতে বললে সে,

—দাঁড়িয়ে কেন? বসো, বসো!

চেয়ারটা টেনে আগুনের কাছে বসলাম। লাল আভার সামনে হাত পা মেলে ধরলাম। সে বাঘের মত সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে। লোহার কাঠি দিয়ে আগুনটা উস্কে দিল।

—তুমি বেঙ্গলী?

—হ্যাঁ।

—মুসাফির? ভায়োলিন বাজাও?

—হ্যাঁ।

—এই শহরে রুজির সন্ধানে এসেছো? হোটেলে যেতে চাও এখন? গনগনে জলন্ত কয়লা খুঁচিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন করে সে, বলিষ্ঠ পা'দুটো ছড়িয়ে বসে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাথা নাড়ি আমি।

—অলরাইট। আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। আমি সবাইকে বিশ্বাস

করতে চাই। বিশ্বাসঘাতকদেরও। কিন্তু এই রাতে কোন হোটেলে যেতে তো পারবে না, সে বহুৎ দূর। ব্যবস্থা করছি আমি; বাঘটা যেন গর্জন করে উঠল এবার,

—মাঈ! আনাবেলা, আনাবেলা!···

রেডিওতে উঁচুতানে বিলিতি অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে। দরজা খুলে একটা বুড়ি মতন পাহাড়ী মেয়ে এল। তাকে কী বলল সে, বুড়ি বিস্ময়মাখা চোখে আমার দিকে দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

—তোমার একটা চাকরি হতে পারে। বেহালার দিকে তাকিয়ে যেন স্বগতোক্তি করে বিরাট দৈত্যের মতন লোকটা বললে,—স্টেশনের পাশে একটা রেস্তোরাঁ আছে। ক'দিন আগে শুনেছিলাম একজন ম্যানেজার চায় তারা। যদি এর মধ্যে লোক না নিয়ে থাকে, ওয়েল্, ইউ মে বি সিওর!

বুড়ি এল। ছোট টেবিলে থালা বাটি রাখল। একরাশ খাবার, গরম, সুবাসিত।—পাগল করা খাবার। সস্নেহে ডাক দিল বুড়ী, ভাঙ্গা হিন্দীতে বলল,

—চটপট এসে পড়! কিছু নেই আর, ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

মাঠের আরেক প্রান্তে পাশাপাশি দুটো ঘর। দুটোই খালি। তার চার হাত পুবে ঝিরি ঝিরি বয়ে চলেছে পাথরভর্তি সরু পাহাড়ী নদী। তীরে পাতা-শুকিয়ে-যাওয়া কলাগাছের জংগল। তার ওপারে ঢালু মাঠ, এর পর লালমাটির রাস্তা। সেখান থেকে সোজা আকাশে উঠে গেছে সবুজ সর্বোন্নত পাহাড়।

বিছানা কম্বল সব সাজিয়ে রেখে গেছে বুড়ি। কী সুন্দর নাম,—আনাবেলা—কে ও? আনাবেলা একটা লোহার কড়াই-এ গন্‌গনে কাঠ-কয়লার আগুন নিয়ে এল,

—ঠাণ্ডায় রাতে ঘুমুতে পারবে না ছেলে। এবার শোও, কতদূর থেকে এসেছো?

—তুমি বহুৎ করেছো মাঈ! ওদের ভাষা জানি না, কী বলবো ভেবে পাই না।

বুড়ী পানের রসে সিক্ত লাল দাঁত দেখিয়ে মুখজোড়া সরল নির্মল হাসি হাসে তার সুখের কপালের রেখায় কাঁপুনি লাগে।

—শুয়ে পড়ো ছেলে! শুয়ে পড়ো! আজ কী ঠাণ্ডা রাত···

দূর থেকে ভেসে আসছে গীটারের সুরবিস্তার আর দরাজ সবল কণ্ঠের মিলিত গানের রেশ, আর শিস্। ঘুমে জড়িয়ে এলো দু'চোখ। এবার সব

ভুলতে চাই। অতীতের সব ভুলে যেতে চাই, শুধু মধুর আরামের নিশ্চিত বর্তমান···

—দরজায় খিল লাগিয়ে দাও ছেলে। বুড়ী বাইরের কনকনে ঠাণ্ডায় বেরিয়ে গেল।—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! ভগবান তোমার···

কানের কাছে ক্ষীণ স্রোতা নদীর একটানা শব্দ; ঝির ঝির ঝির ঝির··· এসো ঘুম, স্বপ্ন এসো···

আর সে কি ঘুমের ধুম আমার। পরদিন যখন শীতের স্বল্পায়ু দুপুর গতপ্রায়, তখন দরজায় ধাক্কা লাগাল বুড়ী। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দরজা খুললাম। বুড়ীর রেখায়িত মুখে হাসি ফুটল,

—বাপরে, কি ঘুম তোমার?

—চার রাত ঘুমুইনি। চার আঙ্গুল তুলে ওকে দেখাই।

—কতবার এসে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে গেছি! বুড়ী পান চিবিয়ে হাসেই।—আমার নাতিন নতুন-আসা মুসাফিরের কথা শুনে দেখবে বলে পাগল। সকালবেলা স্কুলে গেছে। আমি বলি, আমার নাতজামাই এসেছে! দিব্যি বাংলা হিন্দি ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলে চলে বুড়ী,

—বটে? দুজনে প্রাণখুলে হো হো করে হেসে উঠলাম।

বুড়ী কচি মেয়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। খাবার নিয়ে ফিরলো। খেতে খেতে শুধাই,

—সাহেব কই?

—আরে, ওতো ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেছে। কাজের লোক, কত জায়গায় যাবে, ফিরবে কখন ঠিক নেই। পাগল একটা···

হঠাৎ জানালায় উঁকি দিয়েই বলে উঠল বুড়ী,

—ওই এলো রোজেনা এলো!

আমিও উঁকি দিলাম। রোজেনা? সে কে?

শালোয়ার পাঞ্জাবী-পরা দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে মাঠ দিয়ে দৌড়ে ঘরে উঠল।

—বাঃ, আমার নাতনী! পাহাড়ী বুড়ী আমার বোকামিতে যেন অবাক হয়ে যায়।

—তোমার নাতনী? আমার বিস্ময় থৈ পায় না।—ওর পরনে যে পাঞ্জাবী মেয়ের পোষাক!

—ওইতো, বুড়ী পান চিবোয়,—আমার বোকামির বহর দেখে যেন ওর মনে

কল্পনা জাগে রীতিমত।—এও বুঝলে না বোকা ছেলে? তোমাদের লায়ন সাহেবের মেয়ে রোজেনা। আর রোজেনার মা, যে আট বছর আগেই মারা গেল, সে ছিল আমার একমাত্র মেয়ে।

—ও? এবার বিস্ময়ে চোখ গোল করে তাকাই আমি বুড়ীর দিকে। নতুন করে যেন আবিষ্কার করি ওকে।

—এই যে রোজেনা খুঁজছে আমাকে! বুড়ী জানালায় উঁকি দিল। আমিও দেখলাম। পরনে লাল শালোয়ার। গায়ে পাতলা হলুদ রঙের পাঞ্জাবী, বুকের উপর এলিয়ে-পড়া সাদা ওড়না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে আর মিষ্টি রিনরিনে গলায় ডাকছে,

—গ্র্যানি, গ্র্যানি-ই-ই…

—রোজ্-জেনা-আ! বুড়ী কাঁপা কাঁপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল। রোজেনা এক-লাফে বারান্দা থেকে মাঠে নামল, ভেড়ার ছানার মত লাফাতে লাফাতে ছুটে এল,

—কই, মুসাফির কোথায় গ্র্যানি?

—এই যে, এই যে আমার নাতজামাই, বুড়ী লাল দাঁত মেলে হি হি করে হেসে উঠল। কুঁচকানো মুখে ছোট্ট চোখদুটো ডুবে গেল।

ভিতরে এসে দাঁড়াল রোজেনা। স্থির নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাকাল আমার চোখে। ষোলর বেশী বয়স হবে না। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। পিঠে বিসর্পিল বেণী, উঁচু কপাল, লাল টকটকে মুখের রঙ কমলালেবুর মতন। ছোট পাতলা নাক, সরু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি গভীর কালো চোখ। আর কী উচ্ছল স্বাস্থ্যের বাহার তার নবযৌবনের শরীর জুড়ে। উন্নত সবল সুঠাম বুক, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, দুটি লম্বা বলিষ্ঠ হাত দুলছে দুপাশে। কচি মেয়ের মত ফোলা ফোলা গাল। ছোট চোখে তীব্র কৌতূহলী দৃষ্টি। ওকে দেখলে মনে হয় যেন কোন সুন্দরী নাগিনী জীবনের সুরে মুগ্ধ হয়ে ফণা মেলে দাঁড়িয়ে দুলছে। পাঞ্জাবের রুক্ষ প্রাণবন্ত স্বাস্থ্য আর পাহাড়ের সাবলীল সজল সবুজ প্রাণ অপরূপ ন্দ মিশেছে ওর শরীরে।

রোজেনা! রোজেনা! কী সুন্দর নাম! রোজেনা! কোন সংকোচ নেই তার। রুক্ষ সবল পাঞ্জাবের ও সহজ সরল সবুজ পাহাড়ের মিলিত প্রাণসত্তা ধমনীতে। যেন ললিত লবঙ্গলতার মত প্রতি পদক্ষেপে লজ্জায় নুয়ে ভেঙে হয়ে পড়বে রোজেনা? স্থির নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে আমাকে যেন কয়েকটি মুহূর্ত পরখ করে

দেখল সে, তারপর তাকাল বেহালার বাক্সের দিকে। এগিয়ে গিয়ে বাক্সটা খুলল, উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠল রোজেনা,

—ওঃ, ভায়োলিন! তুমি বাজাতে জান? তোমার নাম কী মুসাফির?

বুড়ী ওর কাণ্ড দেখে হাসছে। আমিও হাসলাম! মাথা নাড়লাম। লাফিয়ে উঠল সে,

—শোনাও, বাজিয়ে শোনাও মুসাফির!

—এখন নয় রোজেনা, এখন নয়! বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম···

আহত দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকাল রোজেনা! ছোট চোখ দুটি নেচে উঠছে রুক্ষ উত্তেজনায়। গালটি ক্ষুব্ধ অভিমানে আরো ফুলে উঠেছে।

—কখন বাজাবে?

—রাত্রে, সন্ধ্যের পর, এখন বিকেলে কি ভাল শোনায় ভায়োলিন?

—বেশ, রাত্রে বাজাবে! যেন খুশী মনে মেনে নিল সে। রোজেনা বুড়ির মুখের সামনে ওড়না নাচিয়ে মুখিয়ে উঠল,—খেতে দেবে না, গ্র্যানি?

—যা, তোর ঘরে এক ঝুড়ি কমলালেবু রেখেছি আজ। নিয়ে আয়!

বলতে না বলতেই ভেড়ার ছানার মতন তিড়িং লাফ মেরে রোজেনা দৌড় দিয়েছে। ছুটতে ছুটতে এল আবার। হাঁপাচ্ছে। ওড়নায় বেঁধে এনেছে অনেক কমলা ওর গালের মত লাল। টেবিলের উপর ব্যস্ত হাতে গুটিকয় সাজিয়ে রেখে একবার বলল,—খাও তারপর একটার পর একটা লেবু খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরতে লাগল। বুড়ি বিকেলের চায়ের জোগাড়ে চলে গেল।

খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চটপট কয়েকটা কমলালেবু শেষ করে ফেলল রোজেনা। এর পর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল,

—কই বসে রইলে যে? আমাদের বাড়ী কারখানা সব দেখিয়ে নিয়ে আসি, চল? অনর্গল ইংরাজীতে চমৎকার কথা বলে চলে রোজেনা, আমি তাল সামলাতে পারি না···যেন ওস্তাদ গায়িকার সঙ্গে তবলা সঙ্গৎ করতে বসে হেরে গেলাম।

—ভাল লাগছে না!

—ভাল লাগছে না? সে কি! যেন নতুন কথা শুনেছে সে···

—হ্যাঁ, জ্বর এসেছে?

—জ্বর? রোজেনা অবাক মানে। সে আবার তোমার হবে কেন? সে কি রকম?

—আমার গা পুড়ে যাচ্ছে, রোজেনা! মাথায় ব্যথা, এরই নাম জ্বর!

—কই দেখি, ওর সবল লম্বা হাতে আমার হাত তুলে ধরল রোজেনা। খুশীতে নেচে উঠল,

—আঃ, কি চমৎকার গরম তোমার শরীর? হিংসে হয় তোমাকে। এই শীতের রাত্রে তোমার তো শীত লাগবে না? আমার যদি এমনি জ্বর হতো! হাততালি দেয় সে।

বুড়ী ডাকতেই চলে গেল রোজেনা। পশ্চিমের জানালা খুলে দাঁড়ালাম। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। শীতে কেঁপে উঠছি। বাইরে তাকালাম। কাঠের বেড়ার ওপাশে স্তূপাকার গাছের গুড়ি আর কাটা জ্বালানী কাঠ! রান্নার কাঠ বিক্রি হয় ওখানে ওজন করে। গাছের ডালের বিরাট স্তূপের পাশে ছোট এক-সারি মাটির একচালা। নেপালী ক'জন থাকে এখানে। পাশ ঘেঁসেই সরু পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে চুপি চুপি—আর তার ওপারে উঁচু নীচু শুকনো ঘাসে ছাওয়া মাঠ, তার বুকে সুঠাম সবুজ পাইন গাছের মেলা। লালচে পাতা তলায় ঝরে পড়ে, সারা মাঠ জুড়ে চমৎকার মস্নন আস্তরণ, তার পরেই পাহাড়ের সারি, তার গা জুড়ে শুধু নিশ্ছিদ্র পাইনের সবুজ বন। ওর ফাঁকে ফাঁকে নাকি ঝর্ণা ধারা বয়ে চলেছে নীরবে। বসে আছে বর্ষার অপেক্ষায়—তখন যৌবনের রঙে নাচবে সে, ধেয়ে যাবে সমুদ্রের দিকে বিপুল উচ্ছাসে?

ডুবু ডুবু নিস্তেজ সূর্যের আলো যেন পৃথিবীর মায়া ছাড়াতে পারে না? ছায়া নেমে এসেছে আমাদের চারপাশে, মাঠে, পাহাড়ে? শুধু ওই পাহাড়ের মাথায় এক ঝাঁকে সবুজ পাইনের চূড়ায় মুমূর্ষু সূর্যের মলিন চুম্বনের মত লেগে আছে এক ঝলক হলুদ আলো। অতি ধীরে সেই হলুদ আলো ম্লান হয়ে আসছে, এবার তা শুধু গোলাপী নিরুত্তাপ আভা, আলো নয়, রোদ নয়। একটু পরে তাও মিলালো। পাহাড়ে পাহাড়ে ছায়া নেমে এল। নীল ঝকঝকে আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলে উঠল। রাত আসছে ঠাণ্ডা বাতাস আর বরফ নিয়ে আর—চিমনীর পাশে গরম স্বপ্ন নিয়ে...

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসে রইলাম বিছানায়। ঝিমঝিম করছে মাথা। বুক টনটন করছে। কাঠের কারখানায় করাতের ক্যাস ক্যাস্ একটানা আওয়াজ স্তব্ধ হলো এতোক্ষণে। এবার রাত আসুক। সবাই প্রস্তুত।

বাইরের তরল অন্ধকার থেকে রোজেনার কলকণ্ঠ ভেসে এল। দরজা ঠেলে ভিতরে এল সে,

—আঃ, কেমন অন্ধকারে বসে আছো। তুমি ভূত, না রবীন? রোজেনা যেন খেলার সাথী পেল বহুদিন পরে, এমনি অকারণে উচ্ছল হয়ে ওঠে। বাত্তির বোতামটা টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল রোজেনা,—হেভেন্‌স্‌। কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছ তুমি! গ্র্যানিকে ডাকি, তার বুড়ো বর এসেছে, আমাদের গ্র্যাণ্ড পা! খিল খিল করে হাসতে হাসতে দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে লুটিয়ে পড়ে। একটা সবুজ ওভার কোটে তার শরীর জড়ানো। বেহালার বাক্সটা তুলে নেয় সে,—

—চলো, ভায়োলিন শুনবো! কম্বলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

—চলো!

বাইরে পা ফেলতেই ঠাণ্ডার এক ঝাপটায় যেন অবশ হয়ে গেলাম। রোজেনা খিলখিল হেসে দৌড়চ্ছে। আমিও। এলাম গতরাতের ঘরটিতে। চিমনির পাশে বসে বুড়ী উল বুনছে একমনে। একরাশ কাপড়ের উপর গলা থেকে পা অবধি জড়িয়ে পরেছে মুগার কাপড়, গায়ে লাল উ'লে বুকখোলা জামা। গলায় বেশ বড় বড় লাল গোটার মালা, হাতে চুড়ী, কানে দুল।·· বুড়ী হাসল,

—এসো ছেলে, চিমনির ধারে এসে বাজাও!

সামনে লালচে শিখায় নাচছে আগুন। ঘরের সাদা দেয়ালে দেয়ালে নাচছে লাল আভা। রোজেনা একটা চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

—বাজাওনা রবীন? বাজাও!···

—বাজাব? বেহালা গলায় ঠেকিয়ে রোজেনার মুখে তাকাই। কী বাজাই? ওর দিকে তাকালেই মানসচক্ষে জেগে ওঠে কেদারা রাগিনীর নায়িকার রূপ: নবীন যৌবনের ঢলঢল লাবণি কেদারিকার তনু দেহের বাঁকে বাঁকে; তার ভ্রমর-কালো চুলে সর্পভূষণ, মাথার পাশে যেন নেমে এসেছে কালো ভাগীরথীর স্রোত; আর তার সমুন্নত কপালে সুনিপুণ চন্দ্রকলা। সে পরেছে গৈরিক বাস। নবীনা যোগিনী কেদারিকা। নায়ক দীপক তাকে ভালবাসে প্রাণ দিয়ে। কেদারিকা তার সহচরীদের সঙ্গে মনের আনন্দে নেচে চলে; গান গায় মধুর স্বরে; সেই সঙ্গে অন্য সাথীরা মৃদঙ্গ ঘণ্টা বাজিয়ে তাল দেয়, শঙ্খে ধ্বনি তুলে বনানীর দিকে দিকে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে। বনে বনে ঝরণার ঝিরিঝিরির সাথে সুর মিলায় কেদারিকার নৃত্যরতা পায়ের নূপুরের রিনিঝিনি রিনিঝিনি···

মিনিট পাঁচ পরে প্রচণ্ড শব্দের ঝড় তুলে বাইরে এসে থামল একটা মোটর বাইক। আমার বাজনায় ছেদ পড়ল একবার, তারপরেই আবার শুরু করলাম, ডুবে গেলাম সুরের গভীরে। আমার প্রিয় কেদারিকা নেচে চলেছে বনে বনে; ঝর্ণার পাশে পাশে; নূপুরে রিনিঝিনির সাথে তার চঞ্চল যৌবনের ছন্দ ফুটে উঠেছে আমার বেহালার সুরতন্ত্রীতে। প্রতি মুহূর্তে আমার আকাশে বাতাসে রূপান্তর ঘটল, আপন হারিয়ে সুরসায়রে ডুব দিলাম আমি···

কেদারিকার নাচ যখন থামল তখন যেন প্রচণ্ড শীতের রাতেও ঘাম ঝরছে আমার কপালে। বুড়ী দেখি চোখ কপালে তুলে তাকাচ্ছে আমার দিকে। এবার চোখ কুঁচকে মুখ জোড়া হাসি হাসল। রোজেনা কলরব করে হাততালি দিয়ে উঠল। হঠাৎ পিঠের উপর বাঘের থাবার মত একটা হাতের স্পর্শে চমকে ঘাড় তুলে দেখি: দুর্ভেদ্য প্রাচীরর মত আমার পিছনে দাঁড়িয়ে লায়ন সাহেব, যেন দৈত্য, জমকালো গোঁফের ফাঁকে বিচিত্র হাসি হাসল সে,

—মিউজিক আমি বুঝিনা, বেঙ্গলী বয়! আমি বুঝি কাজ—কাজ। কিন্তু সোজা কথায় আজ তোমাকে বলছি ডিয়ার, আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। গড্ ব্লেস্ ইউ!···

মৃচকি হেসে বেহালাটা বাক্সে পুরতে লাগলাম। বুড়ী উঠে দাঁড়াল, কাঁপা গলায় বলল,

—আমায় যেতে হচ্ছে এবার!

—আর রোজেনা ডার্লিংকেও যেতে হচ্ছে। সস্নেহে হেসে উঠল বিরাট পুরুষটি, সকৌতুকে তাকাল মেয়ের দিকে,—পরীক্ষা এসে গেছে না ডার্লিং?

—হুঁ, বাবা! মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে মেয়েটিও চলে গেল।

এবার সাহেব পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল আমার চোখে। প্রকাণ্ড দুটী থাবা চিমনির সামনে মেলে ধরে চেয়ারে বসে পা দুটি ঘুড়িয়ে দিল।

—বসো রবীনবাবু! তোমার সঙ্গে গল্প করি আজ। বহুৎ কাজ করলাম। সকালে বেরিয়ে এই ফিরছি! হ্যাঁ, রেঁস্তোরার চাকরিটা তুমি পেয়েছো। ত্রিশ টাকা মাইনে···

ওর পাশাপাশি বসতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে আমার। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার, প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ। আর আমি? এই জীবনটাতো কর্মহীন আলস্যে স্বপ্ন দেখে দেখেই কাটিয়ে দিলাম।

• দেয়ালে লাল আভার নৃত্য। ওপাশের ঘরে চেঁচিয়ে পড়ছে রোজেনা।

পরীক্ষার পড়া। দরজা ভেদ করে হিমেল বাতাস বেয়ে কাঠের কারখানার মিস্ত্রীদের আনন্দ কলরবের রেশ ভেসে এল। গীটারে মধুর সুরতরঙ্গ তুলছে, টুং টাং ঝিম্‌ঝিন্‌, আর কে যেন বাজাচ্ছে মাউথ অর্গ্যানে হালকা গানের সুর··· আর আরও দূর থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিমানো সুরে মিলিত গানের রেশ, সঙ্গে ঢোলের মৃদুমন্দ তাল। বুড়ী পান খেয়ে বাড়ী কাঁপিয়ে কাশছে। বাইরে তুষারঝরা শীত। ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ তারায় তারায় ভরা নির্মেঘ নীল আকাশ। পশ্চিম দিগন্তে বিরাট ছায়াকালো পাহাড়ের মাথায় শুক্লা দ্বিতীয়ার একফালি ম্লান বিব্রত চাঁদ, যেন নবীন অস্বীকৃত অচেনা এক প্রতিভা···সামনে যার উচ্ছল উজ্জ্বল পূর্ণিমা-রজনীর আশ্বাস।

পাথুরে কয়লার আগুনে কী মধুর আমেজ ঘর জুড়ে—আর ওই যে টেবিলে শান্ত শুয়ে ঘুমুচ্ছে আমার বেহালার বাক্স, আমার স্বপ্ন, আমার শ্বাস, আমার প্রাণ, আমার প্রেম, ধ্যান ধারণা। আমার সব কিছু। আমার ঈশ্বর! আহা, এখানেই তবে বুঝি আমার শান্তি খুঁজে পাব। আমার আত্মার সুর—আমার শান্তি—বিশ্বাস, ভালবাসা আর সহজ সরল প্রাণের আনন্দে মিলিত সুরলহরীর মত আমার সেই শান্তি!

স্টেশনের কাছেই সিঙ্গাপুর রেস্তোরাঁ। প্রতি তিনমাস অন্তর নাকি হাত বদল হচ্ছে। প্রথমে খুলেছিল এক চীনেম্যান, তারপর নানান হাত ঘুরে ইদানিং বাঙ্গালী ছোকরা কজনের হাতে পড়েছে। ছোট ছোট কেবিন, নড়বড়ে চেয়ার, টেবিল, পানের চুনে চুনে সাদা ছোপ লেগেছে এখানে সেখানে। এক এক কেবিনে এক এক দল লোকের আড্ডা। কোনটাতে উঠতি কবির দল, সেখানে শোনো গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অজাতশ্মশ্রু পরীক্ষায় ফেল্‌-করা ছোকরাদের নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি। আরেকটা খেলা-রসিকদের সগর্জনে টেবিল চাপড়ে কলকাতা লণ্ডন সিডনীতে কোন খেলোয়াড় ভুল নিয়মে খেলে খেলাটা পণ্ড করে দিল তারই প্রত্যক্ষদর্শনের জ্বালাময়ী বিবরণ। কোনটাতে দুর্ধর্ষ কেরাণীর গল্প। শুধু ফাইল বড়বাবু আর সাহেব। অন্যটাতে ঢুলু ঢুলু চোখ, উস্কো-খুস্কো-চুল, চশমা-চোখে নব প্রেমিকদের কুঞ্জ! শুধু কানে কানে কথা, ফিস্‌ফাস্‌ দু'একটি গানের কলি। দু'একটি অনুচ্চারিত মেয়েলি নাম: চামেলি, রেবা, আভা, কবিতা, শেফালি আর সুমিতা। সব হতভাগারাই ভাঙ্গা চুনলেপা চেয়ারে বসে চায়ের হুকুম ছাড়ে, ওইমাত্র। আর

কিছু নয়। শুধু খেলোয়াড়রা মাঝে মাঝে সদম্ভে চপ্ সিঙ্গাড়ার ঢালাই হুকুম ছাড়ে।

কিন্তু কী নিবিড় অবিমিশ্রিত প্রশান্তি মনে। এতো আকাশ জোড়া শান্তি কোথায় লুকিয়েছিলে এতদিন? সকালে উঠে দেখি বরফে সাদা হয়ে আছে টিনের চাল, মাঠ। সব কিছুর উপর যেন চিনি ঢেলে রেখে গেছে কেউ। উজ্জ্বল খুসীর আকাশ। নীল, নীল। নির্মেঘ, কুয়াশার চিহ্নটুকুও নেই। সব গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে গেছে, শুধু পাইনগাছের সারি সবুজে সবুজ। ওদের জরা নেই। পাহাড়ীয়া সহজ সরল সুন্দর প্রাণ কিনা তাদের ···চিরসবুজ হাস্তেলাস্তে অভিনব পাইনের বনেই পাহাড়ের শান্তির খবর ছড়িয়ে আছে।

প্রকৃতিকে কি কখনও হাসতে দেখেছি? গাছের পাতাকে?···আকাশ কে? এই দেখলাম আমি—শীতের সকালে আশ্চর্য এই পাহাড়ে। হাজারে হাজারে নতুন নবীন ঘন সবুজ পাইনগাছ। দু'ইঞ্চি থেকে পাঁচফুট লম্বা। বড় গাছগুলো থেকে ঝরে পড়েছে রাশি রাশি লালচে পাতা, পালিস আস্তরণ বিছিয়েছে পায়ের নীচে। রোদে খলখলিয়ে হাসছে ওরা। নীল আকাশ, তার নীচে সর্বোন্নত পাহাড় আর সুদূরপ্রসারী সবুজের তরঙ্গ। যেন রাত্রি-রাজার হারেমের হিমশীতল যন্ত্রণা অত্যাচারের অবসানে মুক্তি পেল সুন্দরী দাসীর দল। ধেয়ে আসছে ঝির ঝির মিষ্টি হাওয়া, দুলছে কচি বুড়ো পাইনের ডাল, আর সরু সতেজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঠছে কিশোরীর অর্থহীন খুশী মনের হাসি, প্রথম যৌবনের রহস্যঘেরা সন্তর্পণে কানাকানি! ···লালচে পাইন পাতার আস্তরণে শুয়ে আকাশে চোখ মেলে দৃষ্টিকে সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া—এর চেয়ে শান্তি কী আর কোথায়!·'

তোমার আমার আশেপাশে উপরে নীচে ঢালু পাহাড়ের প্রতি অঙ্গভঙ্গিমায় শুধু সবুজের সমারোহ। শুধু ফিস্‌ফিসে হাওয়া, পাতার ফাঁকে ফাঁকে কানাকানি, হাসাহাসি—এরই নাম যৌবন। মৃত্যুহীন জরাহীন যৌবন।

এই সত্য সুন্দর আর কল্যাণের মহামিলন সংগীতেই রয়েছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্পন্দনের সুর। বুক ভরে টেনে নিতে দাও সেই প্রাণময়ী আত্মার আলোর সুবাস...

সেই সবুজ নীল আর সোনালী রোদের উৎসবে চোখ ভরে স্বপ্ন নামে আমার। আমি স্বর্গের দেবদূত হয়ে যাই যেন—যার প্রাণে মানবতার জরাহীন অমৃতের সুর।···ভালবাসার স্বপ্ন জাগে।

একমাস যেতে না যেতেই উঠে গেল সিঙ্গাপুর রেস্তোরাঁ। এবার আর রেস্তোরাঁ নয়। এক সিন্ধী বড় কাপড়ের দোকান খুলবে এখানে। কী করবো আমি? কলকাতায় যা করতাম। প্রায় প্রতি কেবিনের ছেলেদের বললাম একটা ছাত্র পড়ানো জুটিয়ে দিতে। ঢুলু-ঢুলু চোখের কবি একজন বললে, তার এক মাসিমা মাস্টার চাইছেন তিন ছেলের জন্যে। সবদিন পড়াতে হবে, মাসে কুড়ি টাকা। রাজি হয়ে গেলাম। লায়ন সাহেব জোরে পিঠ চাপড়ে দিল।

—ঘাবরাও মৎ বেটা, যতদিন ভাল রুজির ঠিক না হচ্ছে, আমার ঘরতো খালিই পড়ে আছে, নিশ্চিন্তে থাকবে। তুমি লেখাপড়া জানা লোক, আর্টিস্ট! হ্যাঁ, আর আমার দু'একটি চিঠি যদি মাঝে মাঝে লিখে টাইপ করে দাও, রবীনবাবু, বড় ভাল হয়। সময় পাই না একেবারে। আর রোজেনাকে একটু ইংরিজিটা শেখাবে? কনভেন্টে পড়ছে, ইংরিজিটা আরও ভাল করে জানা দরকার তার! এ্যাঁ?

ভাল বলল কি খারাপ বলল যেন বুঝতে পারছে না দৈত্যের মত সহজ সরল লোকটা, চোখ গোল করে আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। সিংহের মত দরাজ অন্তর তার; নির্ভয়, নিঃসংকোচ, উদার; তাই তার আসল নাম ভুলে গেছে সবাই, নাম রেখেছে লায়ন সাহেব।

আমি সবার মুখের দিকে তাকাই। বুড়ী আর রোজেনা নির্বাক, আমাকে দেখছে। আমি হেসে উঠি, দুই হাত চিমনির আগুনে মেলে ধরি,

—এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে, সাহেব জি! আশীর্বাদ করো যেন আমি তোমাদের স্নেহের মর্যাদা রাখতে পারি, বেইমানি না হয়!

—এ কি কথা রবীনবাবু! তুমি শিক্ষিত, আর্টিস্ট! তুমি বেইমানিতে যাবে কেন? প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে লায়ন সাহেব নীরবে আমার পিঠ চাপড়াতে থাকে শুধু। অনেক পরে ধীরে ধীরে স্বগতোক্তি করে যেন: অনেক দেখেছি, অনেক ঠকেছি, লোক চিনি আমি। ভাল মানুষকে পাবার জন্যে পাগল আমি। আমি বিশ্বাস করতে চাই সবাইকে, ভালবাসতে চাই যে সবাইকে, আমার মনের শান্তির এই-ই গোপন খবর! আমি বিশ্বাস করি মানুষকে, ঠকেও যে বিশ্বাস করি! এই সাধারণ পাহাড়ী লোকগুলো যারা বর্তমানের বহুল প্রচারিত সভ্যতার খবর রাখে না, তাদের কাছেই আমি এই বিশ্বাস ও সাধারণ জীবনযাত্রার জ্ঞান পেয়েছি। বর্তমান শহরে সভ্যতা মানুষের হৃদয় কেড়ে নিয়ে বিনিময়ে দিয়েছে হায়েনার নির্মম ধূর্ততা। মানুষকে বাঁচতে হলে, শান্তি পেতে হলে এই পাহাড়িয়াদের মত

পরস্পরের মাঝে বিশ্বাস আর প্রতিযোগিতাহীন সহজ নিঃসকোচ জীবনযাত্রার শিক্ষা নিতে হবে রবীনবাবু!

নির্মম দস্যুর মত চেহারার অন্তরালে নিভৃতে লালন করে সে প্রেমে-বিশ্বাসে-সহানুভূতিতে-মমতায়-ভরা আশ্চর্য বিরাট হৃদয়। লায়ন সাহেব। আজ মন জুড়ে খুশীর হাওয়া বইছে। আজ আর জ্বর জ্বর ভাবটা নেই···

এখান থেকে মাইল দুই দূরে পাহাড়ের বুকে সবুজ—বাংলো। ঢুলুঢুলু চোখ কবিটি আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। তিনটি ছেলেকে নিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা। ভদ্রলোক নাকি কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বাড়ীতে বড় একটা থাকেন না। মিসেস সেন-ই সব কিছুর মালিক। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, খড়্গ নাসা, চশমা চোখে। আর কী ভীষণ সন্দেহমাখা দৃষ্টি! কর্কশ গলার স্বর। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছেন ভদ্রমহিলা। ভয়ংকর চোখ দুটি ঘুরছে। মন দমে গেল।

—রমেন বলেছে তো কী করতে হবে? বসে যান এবার। এই তিনটি আপনার ছাত্র! কিন্তু মনে রাখবেন নিয়মিত আসতে হবে আপনাকে!···

নীরবে মাথা নাড়লাম!

কবি-কবি-ভাব ছেলেটির নাম রমেন। সে আমায় নমস্কার করে চলে গেল। ছেলে তিনটিকে নিয়ে বসলাম। বাইরে শীতের বিকেল নেমে এসেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরেছে। খুক খুক করে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে লাগল বাচ্চা তিনটি।

—কি খোকা, হাসছো কেন?

—তোমাকে একটি বুদ্ধু লাগছে কিনা! বড়টি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—কালো কোট গায়ে যেন উল্লুক। এবার দ্বিতীয়টা।

আমি কেঁপে উঠি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে। লায়ন সাহেব আদর করে কালো ওভারকোট কিনে দিয়েছে আমায়।

—কি, পড়াতে শুরু করেছেন? মিসেস সেন তেড়ে এলেন আবার। —দু'ঘণ্টার আগে উঠবেন না যেন! এখানের মাস্টারগুলো কলকাতার মতন নয়। এসেই খালি ফাঁকির ধান্দা, খালি উঠি উঠি করবে। হ্যাঁ, ওই কোনায় কি দেখছেন তাকিয়ে? রেডিও? এই জিনিষ আপনাদের জংলী শহরে কোথাও পাবেন না। শুধু একটা নাকি এক মিনিস্টারের বাড়ীতে আছে শুনেছি···

কেঁপে উঠলাম আবার। ঠাণ্ডা! হা ভগবান। এই শান্ত সবুজ পাহাড়ে জমকালো জটিল জীবগুলোকে আসতে দাও কেন? ওদের বড় বড় যত জাঁকালো নিওনের আলোজ্বলা রাজপথের নগরে নিয়ে যাও। আমাদের শান্তি দাও!

পরদিন পাহাড় বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সবুজ বাংলোয় ঢুকলাম। তিনটি ছেলে মাঠে গুলি খেলছে। তখনো হাঁপাচ্ছি, বললাম,

—এখন খেলা রেখে দাও, কেমন? এসো পড়ি!

—দাঁড়াও, বুদ্ধুমামা! দাঁত খিঁচিয়ে বড়টি হাসল।

—কালো কোট গায়ে উল্লুক, দ্বিতীয়টি থুতু ফেলে গুলি মারল।

—হি হি-হি···

তিন নম্বরটি জুতোর ডগা দিয়ে একটা পাথরকুচি আমার দিকে ছুঁড়ে মারল।

নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম, পাহাড়ে চোখ ঠেকিয়ে। মিনিট পনেরো পরে মিসেস্ সেনের আবির্ভাব। চোখ দুটি পাক খেয়ে উঠল। কর্কশ বাজখাঁই গলা বেজে উঠল,

—আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, এ্যাঁ?

—ওরা যে আসেনা! অসহায় মুখভঙ্গি করে তাকাই আমি।

নীল আকাশে বিকেল ঘনায়। শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ এরই মাঝে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাচ্ছে আকাশে, সূর্য ডুবলে আলোর গান ধরবে সে।

সুন্দর! সুন্দর! শান্তি! শান্তি!

—আসেনা? মিসেস্ সেন খেঁকশিয়ালের মতই খেঁকিয়ে উঠলেন দাঁত দেখিয়ে।—বলতে লজ্জা হওয়া উচিত আপনার! আপনি ওদের মাস্টার নয়?

এবার এক দৌড়ে বাচ্চারা ভিতরে পালায়। আমিও গিয়ে বসি। ওরা মিনিট দশ পরে খেয়ে দেয়ে এসে বসে, একটার পর আর একটা ঢেকুর তোলে।

—ওঃ, আজ সন্দেশগুলো চমৎকার হয়েছিল, নারে ভোম্বল? বড়টি একটি কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে।

—উঃ, আর বলিস কেন, বেচারীর জিভে জল ঝরবে। হ্যাংলা! দ্বিতীয়টী ফিসফিস করে বলে ওঠে, আমার দিকে তির্যকদৃষ্টি হানে।·· চমৎকার! ··

হেসে গড়াগড়ি যায় তিন জন। মিসেস্ সেন পর্দা ঠেলে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েন। চুপ সব। আমিও নির্বাক। নিথর। কর্কশ গলার স্বর ভাঙ্গা বাটীর মত ঝন্‌ঝন্ করে উঠল আমার কানে,

—শুনুন। আপনার পড়ানো গতকাল লক্ষ্য করেছি আমি। ভাববেন

না যেন আমি এখানকার জংলী মেয়ে! সব বুঝি আমি, দুনিয়ার সব খবর জানি! কলকাতার বেথুনের ছাত্রী আমি! যেন গরবিনী রাজকন্যা তার বংশ পরিচয় বলে যাচ্ছেন এমনি বিজয়িনীর ভঙ্গীতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলে তিনটী মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে তাদের মায়ের বিজয়গাথা শুনছে।

—বেথুনে-পড়া কলকাতার বনেদী বড়লোকের মেয়ে। হুঁ, আপনার পড়ানোর ভঙ্গী অত্যন্ত ডিফেক্‌টীভ! এতে ছাত্র ও অভিভাবক দুজনকেই ফাঁসি দেওয়া হয়—

এরপর আধঘণ্টা ধরে সেই কোকিলকণ্ঠে লেকচার। মাথা ঝিমঝিম, বুক টন্‌টন্, জ্বর জ্বর ভাব। মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাব। কিছুই যেন শুনিনা আমি, মনে মনে কেদারা রাগিনী বাজাই। ওর কর্কশস্বর ছাপিয়ে আমার বেহালার কম্পিত তান আমার কানে ঝরে পড়ে, কেদারিকার নূপুর নিক্কনের ধ্বনি ভরে দেয় আমার প্রাণ—রিণি ঝিনি, রিণি ধিনি ধিনি……

—বুঝলেন এখন, ছাত্র পড়ানোর নিয়ম কি?

—এ্যাঁ?—চমক ভেঙ্গে স্বপ্ন টুটে গেল। ওর ভীষণ চোখে চোখ রাখি আমি।—হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি!

—বেশ, পড়িয়ে যান!

ভদ্রমহিলা পুলিশী কায়দায় নানান অজুহাতে খবরদারি করেন যখন তখন। মন বিষিয়ে উঠে। উপায় নেই। টাকা চাই আমার। রোজেনাকে একটি রঙের বাক্স ও তুলি কিনে দিতে হবে। আমার ধারণা ও ছবি আঁকতে পারবে।

দুইঘণ্টা কোনরকমে কাটিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়াই শীতের রাত্রি তখন জাঁকিয়ে বসেছে। হিম প্রবাহে চোখমুখে যেন অজস্র স্ঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় লোকজন নেই। হাত পা একমিনিটেই জমে অসাড় চেতনাহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু কী শোভা! সরু পাহাড়ীপথের দুধারে পাইনের বনে শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ ততক্ষণে কী কাণ্ডই না শুরু করেছে। আলোছায়া; গাছের তলায় তলায় যেন শিশুমনের মতো অবুঝ আলোছায়ার স্বপ্ন বুনে রেখেছে কেউ। ঝিঁঝিঁর ডাক, জোনাকির দপ্‌দপ্। নীল আকাশের ক্যান্‌ভাসে সাদা তুলির টান মাঝে মাঝে। চাঁদের চারপাশে, পাতলা মেঘের গায়ে গোল রামধনু রঙ্-চক্র। আর পাইনের বন ভেদ করে ছুটে আসে কাছের ক্ষীণস্রোতা ঝর্ণাধারার নিঃসঙ্গ সংগীত,—ঝিরঝির, রিনিঝিনি, রিনিঝিনি। আমি প্রাণভরে শুনতে পাই আমার কেদারিকার পায়ের নূপুর ধ্বনি। বাড়ীতে ঢুকবার মুখেই মিস্ত্রিদের

গানের আসর। গীটার মাউথ্‌অর্গ্যান আর শিস্‌। সারাদিনের কাজের অবসানে সুখী মানুষগুলো আনন্দে নাচে গায়। সুখী? হ্যাঁ, তাইতো! সরল নিরাড়ম্বর জীবনেই রয়েছে সুখ; নাগরিক সভ্যতার বিষফোঁড়ার মত অতৃপ্ত বাসনা জ্বালিয়ে মারে না এই সব সরল সহজ মানুষদের, তাইতো নির্মল মনে তারা গান গায়—

…চাঁদনী রাতে আলুক্ষেতের ধারে ধারে
যেখানে জলের গায়ে আলো ঠিকরে পড়ে—
আমি এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে এলাম—
প্লামের মত তার গালের রঙ;
একা একা গান গাইছে সেই মেয়ে।
যার গানে আলুর ক্ষেতে সোনা ফলবে,
সেই মেয়ে, সেই মেয়ে…

আর আমার ঘরে ঢুকতে গিয়েই কানে এল ওপাশের নেপালীদের গান। ঢোল বাজছে ডুডুম্‌ ডুডুম্‌, হাত ঘুরিয়ে নাচছে একটি জোয়ান লোক, মেয়েরা চায়ের গেলাস হাতে হাসছে। আর শক্ত সমর্থ সরল বুদ্ধি জোয়ান গুলো গাইছে, জ্বলছে দাউ দাউ আগুন…

…মতা তিম্‌রো ভই নি, নালা ও দাইলে মঙানি!
ও—হ! ও—হ! ও—হ!
নালা ও দাইলে মঙানি, নালা ও দাইলে মঙানি…

…হে দাই, আমি তোমার বোনের মত, তাই খুব বেশী প্রীতি দরদ দেখিয়ো না…

এক গভীর শান্তির ছায়ায় ছেয়ে যায় মন। কোনো আফশোষ থাকে না। কোনো অভিযোগ নয়। জরাহীন যৌবনের ছন্দ আমার চারপাশে, আকাশে বাতাসে, চাঁদনী-ঢালা শীতার্ত পাইনের বনে বনে, সমর্থ সুখী মানুষের কণ্ঠে। আমার জ্বর আসে প্রতিদিন। বুক টনটন করে উঠে। কেন গ্রাহ্য করবো আমি? বেহালা তুলে নিলাম। আমার কেদারিকা, এসো! নূপুরের তালে তালে যৌবনের মাতন তুলে তুমি এসো; যৌবনের দেবী তুমি, এসো—

এমনি শীত কেটে গেল। বসন্ত আসছে এবার। বড় বড় এ্যাকেশিয়া গাছে স্তবকে স্তবকে ফুটেছে হলুদ ফুল। আর পত্রহীন প্লাম পীচ নাশপাতির

আলো ভালো অফুরন্ত সাদা ফুলের বাহার। যেন তুষারপাত হয়ে গেছে তাদের উপর। আর সে কী হাওয়া! দখিনা বাতাস। পাইনের বনে সাড়া জাগিয়ে বিপুল আলোড়ন তুলে অট্টহাসি হাসতে হাসতে ধেয়ে যায়—উড়িয়ে নেয় সব কিছু। বাতাসে ভেসে বেড়ায় প্লাম পীচ নাশপাতির অজস্র সাদা ফুলের পাপড়ি। গাঢ় নীল আকাশ আমার অদ্ভুত আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমার জানালার পাশের রডোডেনড্রেন্ গাছে লালফুলের সেকি বাহার! রোজেনার জানালার পাশে ঝুলানো অর্কিডে সাদা ফুল ফুটেছে এবার—

বসন্ত! বসন্ত এসেছে পাহাড়ে, বসন্ত এসেছে সবার মনে।

একমাস শেষ হতেই টাকা চেয়েছিলাম। মিসেস্ সেন খেঁকিয়ে উঠলেন,

—ওঃ, টাকা! তা আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি?

দুইমাস পর অবশ্যি পালালেনই তারা। মিঃ সেন ব্যাংককে সাফল্যের সঙ্গে লালবাতি দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার কলকাতা চলে যাবেন ওঁরা। বিকেলে গিয়ে টাকা চাইলাম। তীব্র অসন্তোষের দৃষ্টি হেনে ভিতরে গেলেন মিসেস সেন। আরেকটি মহিলা বসেছিলেন সেখানে। একমনে মাথা নুইয়ে উল বুনছিলেন। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, প্রখর দীপ্ত চেহারা। বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলসানো দুই চোখে তার বিপুল ব্যক্তিত্বের আভাস। ওই দৃষ্টির সামনে চোখ আপনি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে। একটু বাদেই মূর্তিমতী ত্রাসের মত মিসেস্ সেন এলেন। পনেরোটি টাকা আমার সামনে মেলে ধরে অবজ্ঞায় বিরক্তিতে নাক কুঁচকালেন, ভাঙ্গা কাঁসরের মত গলায় ঝাঁ ঝাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন,

—নিন্, ধরুন। যতো আপদ, এই বিচ্ছিরি জংলী জায়গাটা ছাড়লেই বাঁচি, বুঝলে নিরু?

ভদ্রমহিলাটি মুচকি হেসে সস্মিতমুখে একবার চোখ তুলে তাকালেন শুধু। বোনা চলতে লাগল। আমি নির্বাক স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকি।

—নিন্, দেখছেন কি! থিয়েটার দেখবার সময় নেই আমার! —হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ভদ্রমহিলা দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠলেন,—ধা পড়ানোর ছিরি, বুঝলে নিরু, টাকাগুলো গচ্চা গেল জংলী দেশে এসে!

—দু'মাসে চল্লিশ টাকা হলো না? আমার গলা ফুটে বিস্ময়োক্তি বেরোয়।

—চল্লিশ? গোল চোখ ঘুরিয়ে আর্তনাদ করেন মিসেস সেন। তারপর

গম্ভীর রাশভারি চালে বলে ওঠেন,—চালাকি দেখাবেন না। আমি ভালমানুষ। যা রেট্ তাই পেয়েছেন, ভাগ্য ভাল!

কোন ফাঁকে বাচ্চা তিনটি এসে জুটেছে। বড়টি ফোড়ন কাটলে,

—যা পড়িয়েছে মা, হাফ্ রেট্ দেওয়া উচিত।

—যা বোঁটকা কোটের গন্ধ! কালো কোর্টে উল্লুকের গন্ধ! হি হি করে দ্বিতীয়টি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

টাকা কটি পকেটে পুরে নিঃশব্দে বাইরে এলাম। উতল বাতাস, বিকেলের আলোয় প্রেমভরা আকাশ। বুনোফুলের সুবাস। ধীরে ধীরে নামছি আমি পাথরের রাস্তা দিয়ে। একটু পরেই কাণের কাছে যেন সংগীত জেগে উঠল।

—একটু শুনুন।

থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালাম। সেই বোনা-হাতে ভদ্রমহিলা। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি।

—আপনি রাগ করবেন না। ওদের বাকি টাকা আমি মিটিয়ে দেবো!··· সুরে যেন কত দরদ ঝরে পড়ল।

—সে কি! আপনি দেবেন কেন? আমি বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে প্রতিবাদ করে উঠি।

—না, না! তিনি দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠে।

—আমার অতি দুর্ভাগ্য যে ওরা আমার নিকট আত্মীয়স্থানীয়। ভদ্রমহিলা আর তার ছেলেদের ব্যবহারের জন্যে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। আর টাকাটা—

—ও আপনি মাপ করবেন। আমি পা বাড়ালাম···এ টাকা আর নেব না! আচ্ছা, নমস্কার!

—বেশ। দাঁড়ান, আরেকটা অনুরোধ বাকি। আপনি আমার দুটি ছেলে-মেয়েকে পড়াবেন?

—সে আপনি অনেক লোক পাবেন শহরে! আমার পড়ানোর ছিরিতো দেখলেন! আমি আর ওসব গণ্ডগোলে যাব না!

—কিন্তু আমার ওখানে গণ্ডগোল নেই তো! তিনি পা বাড়ালেন, আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রাখলেন। —আপনাকে যেতেই হবে!

সেই প্রদীপ্ত চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। শ্রদ্ধায় চোখ নত হয়ে আসে। আমি মাথা নাড়লাম।

—বেশ, তবে চলুন!

টিলার নীচেই পাহাড়ী সরু নদীর পাশে ওদের বাড়ী। সবুজ টিনে-ছাওয়া বড় বাংলো। সামনে সবুজ ঘাসের মাঠ, কত ফুল ফুটেছে নানান রঙের। আমাকে ঘরে বসিয়ে তিনি চলে গেলেন। ফিরলেন একটু বাদেই। সঙ্গে একটি ছেলে, বছর বার, আর একটি বছর আটের মেয়ে। সুন্দর সুকুমার চেহারা। এসেই প্রণাম করল আমার পায়ে। তিনি হাসলেন,

—কদিন ধরেই ভাল মাস্টারমশাই একজন খুঁজছি, আজকে পেলাম!

—ভাল মাস্টার! আমি অবাক হই,—আমি ভাল মাস্টার কে বলল আপনাকে?

—বারে! তিনি কেমন সুন্দর হাসতে পারেন বাইরের বিকেলি আকাশের মতন!

ওদের নিয়ে বসলাম। নির্মল আর নীলা। মন জুড়িয়ে গেল। নির্মল বুদ্ধি ওদের, চমৎকার ব্যবহার। একটু বাদেই তিনি একরাশ খাবার এনে সামনে রাখলেন,

—একটু জল খান!

—এতো! হাসিমুখে ওর দিকে তাকালাম আমি! ওঁর চোখ থেকে যেন আমার জন্যে স্নেহ করুণার শান্তধারা ঝরে পড়ছে। মিসেস সেনের মুখে আজ বিকেলেই তার নাম শুনেছি। নিরুপমা। এই মুহূর্তেই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থির হয়ে গেল। এতো অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা করুণার ধন—এতদিন গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল কোথায়! হাসিমুখে নির্ভয়ে ওঁর ভাস্বর চোখে চোখ রেখে বললাম,—এতো খেতে পারবো নাতো, নিরুদি!

—পারবে ভাই। বড় বোনের মত আদরের সুরে বলে উঠলেন তিনি। বাচ্চা দুটিকে বললেন,—যাও, খেলা করোগে এখন, কাল থেকে তোমাদের পড়াবেন মাস্টারবাবু! ...হ্যাঁ, তোমার নাম কী ভাই?

...বলবো, বলবো সব বলবো। করুণা ও ভালবাসা যেখানে প্রস্রবণের মত ফুটে উঠে, সেখানে তো লুকোবার কিছু নেই। সব বলবো...

যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম তখন মাথার উপরে নীল উজ্জ্বল আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে গেছে। হাসুনাহানার উগ্র গন্ধে বাতাস মাতাল। মিষ্টি উতলা বাতাস যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে। মনের অঙ্গণে কেদারিকা নেচে চলেছে, তার নুপুরের রুমুঝুমু ধ্বনি জাগছে আকাশে বাতাসে, পত্রে-পুষ্পে, সবুজ সবুজ ঘাসে ঘাসে, নীহারিকা পুঞ্জে, মানুষের মনে।

বসন্ত এসেছে! পৃথিবীতে বসন্ত এসেছে—আমার তোমার মনে মনে!!

ঘরে ঢুকে বেহালার বাক্সে হাত রাখতেই ছুটে আসে রোজেনা। সবুজ সিল্কের শাড়ী পরেছে সে আজ। খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে কলকণ্ঠে বলে উঠল,

—উঃ, রবীন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ। কী কাণ্ড! বাবা শাড়ী এনে দিয়েছে আজ। এই দেখো দেখি, কেমন লাগছে! আমার সামনে দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, চোখে-মুখে আলোর বান ছুটিয়ে হাসে। ওর মনে এসেছে নবীন বসন্ত।

—ওঃ, রোজেনা! আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম,—চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে—চমৎকার!

—সত্যি? উঃ রবীন! কচি ভেড়ার ছানার মত শূন্যে লাফিয়ে উঠে রোজেনা।—তুমি সত্যি কী ভাল, রবীন! গ্র্যানি বলছিল আমাকে আমাদের নেপালী-ঝির মত দেখাচ্ছিল!

—মোটেই না। ঠিক যেন খুব চমৎকার বাঙ্গালী মেয়ে!...

আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে রোজেনা। আমার ছোট্ট ঘরে যেন জীবনের জোয়ার আসে। পকেট থেকে নতুন রঙ-তুলির বাক্স বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম,

—রোজেনা, তুমি ছবি আঁকবে!

—উঃ রবীন! বিস্ময়ে বোবা আনন্দের প্রাবল্যে যেন আশ্চর্য মেয়ের ছোট কালো চোখদুটি স্থির হয়ে যায়। ও হেসে উঠে, মাথার চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে যেন গান গেয়ে উঠে। আজ আমার কী আনন্দের দিন রবীন! তোমরা সবাই এতো ভাল! বাবা শাড়ী এনে দিল। তুমি ছবি আঁকার রঙ। আর গ্র্যানি কি দিয়েছে জান? ক্যারম্‌বোর্ড! চলো রবীন! খেলবার লোক পাচ্ছি না!

আমার ঠাণ্ডা হাত তার নরম যৌবনতপ্ত হাতে জড়িয়ে দৌড়োয় রোজেনা। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে,

—জানো রবীন? কী মনে হচ্ছে? উঃ, মনে হচ্ছে যেন আজকে আমার জন্মদিন, নতুন জন্ম নিলাম আমি!

...তাই রোজেনা, তাই! নবীন বসন্তের পৃথিবীতে আনন্দের যৌবনরাঙা ঝরনায় স্নান করে নতুন জন্ম পেয়েছি আমরা, রোজেনা! সবুজ ঘাস মাড়িয়ে আমার হাত টেনে রোজেনা দৌড়য়। গীটারের সুর ভেসে আসে সুরেলা বাতাসে...

পৃথিবী ! আমি মরলেও তুমি এমনি সুন্দর অজর অমর হয়ে থেকো…

নিরুদিকে যতো দেখি বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়ে যায়। এর মধ্যে কত জেনেছি তাকে। ইংরাজীতে এম, এ, পাশ নিরুদি। তিনিও কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী মিসেস্ সেনের মত। এখানে মেয়েদের কলেজের প্রফেসর। নিরুদি বিধবা। তার ভাই তিনটি জুয়া আর মদের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে জীবন তরী। বসুমতীর মত স্নিগ্ধ সকরুণ মুখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি মেলে যতো অবাঞ্ছিত অত্যাচার ও পাপ সয়ে যান নিরুদি।

নিরুদিকে যত দেখি তত মুগ্ধ হই। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াই। প্রতিদিনই নতুন কিছু খাওয়াবেন নিরুদি। পড়াতে গেলেই প্লেট হাতে নিয়ে একমুখ হেসে ঘরে ঢুকেন তিনি। একটু লজ্জার সুরে বলে ওঠেন,

—দেখো তো ভাই, ছানার পায়েসটা কেমন হল ?

—চমৎকার নিরুদি ! চমৎকার !

সবদিনই এমন কিছু সলজ্জমুখে সামনে এনে ধরেন নিরুদি। কোন কোনদিনবলে উঠেন,—যাও তো ভাই, নির্মল আর নীলাকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো, পড়ার দরকার নেই সবদিন। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না আজ—

সব বুঝতে পারি আমি। বসুমতীর মতই দয়াবতী নিরুদি। কোন মন্ত্রবলে যেন আমার দুঃখ যন্ত্রনা সব বুঝে নিয়ে আমার ক্ষতস্থানে মায়ার হাত বুলিয়ে দিতে ব্যস্ত তিনি। কোনদিন বা—গান শুনবে ভাই ? যাও তো নির্মল, গ্রামোফোনটা চালিয়ে দাও !

এমনি খেয়ে গান শুনে আর গল্প করে এক একদিন রাত হয়ে যায়, হুঁস থাকে না আমাদের। হঠাৎ বাড়ী কাঁপিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে তার ছোট ভাইরা ফিরে আসে মাতাল হয়ে। সেকি চেহারা তখন নিরুদির। ভয়, ঘৃণা, আতঙ্ক, আত্মার যন্ত্রণা, সব মিলিয়ে এমন একটি অসহায়ভাব তার স্বর্গীয় চোখমুখ আচ্ছন্ন করে ওঠে, যা দেখে সীমাহীন করুণায় নিস্ফল আক্রোশে আমার মন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের চকিতে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে আমাকে খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিয়ে নিরুদি ওদের শুশ্রূষা করতে ছোটেন। মা-বাপ-মরা ছোট ভাই, নিরুদি নিজেকে সামলাতে পারেন না। মাতালগুলো ওকে গালি দেয়, চলে যেতে বলে তাদের বাড়ী ছেড়ে। ধরিত্রীর মত ধৈর্যের প্রতিমূর্তি

নিরুদি রাগ করেন না। তাঁর মুখের হাসি চোখের আলো আর মনের প্রশান্তি কমেনা এতটুকু। দুর্লভ শান্তির খোঁজ পেয়েছেন নিরুদি—

…নিরুদি! তোমার শান্তি আমায় একটু দাও না!

কালরাতে স্বপ্নে নিরুদিকে দেখলাম। নীল আকাশের তলায় পাহাড়ের নিরালায় ফুলের আসনে বসে আছেন নিরুপমা নিরুদি। পরনে সবুজ বেশ, খোঁপায় গোজা শুভ্র ম্যাগ্‌নোলিয়া, কানে ফুলের দুল, গলায় গোলাপের মালা, হলুদ ফুলের বালা। যেন বনদেবী। কিন্তু অতলস্পর্শ বিষণ্ণতার ছায়ায় ঘেরা তার অনিন্দ্য মুখশ্রী ম্লাণ। আমি গিয়ে ওর আলতা রাঙা পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করলাম —তোমার কিসের দুঃখ বলে দাও, নিরুদি। আমি সব দুঃখ মিটিয়ে দিতে এসেছি তোমার! তাঁর বিষাদ-ছায়ামাখা মুখে ম্লান স্তিমিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। যেন পশ্চিম আকাশের অপরূপ অস্তরাগ। বাঁশীর মত মিহি সুরে বললেন নিরুদি,—কিসের দুঃখ হবেরে আবার পাগলা! দেখছিস না পৃথিবী জুড়ে কি নিবিড় প্রশান্তি। ওই দেখ—আকাশ, পাহাড়, বন, ঝর্ণা আর রকমারি ফুলের রাশ। এদের ভাল বেসেছি আমি—আত্মায় টেনে নিয়েছি, আমার চেয়ে সুখী ভাগ্যবতী আর কে আছে ভাই!

এর জবাবে কী বলতে গিয়ে আমার সারা অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল; বুক ঠেলে কথা বেরোতে চাইল। তার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। রোজেনা ডাকছে কোকিলের সুরে,

—রবীন, রবীন! ওঠোনা কেন, রোদে পৃথিবী ভেসে গেল যে! চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। রোজেনার সুরভিতে ছেয়ে গেছে আমার ঘর। আকাশ-নীল শাড়ী পরনে তার। যেন স্বপ্নে দেখা কিন্নর লোকের দেবী। দুহাত পিছনে মুড়ে মুচকি হাসছে সে, ঘাড়ের দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে এলোচুল,

—রবীন, কী এনেছি বলতে পার?

তখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি আমার। ওর তাজা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলাম,

—কী এনেছো, রোজেনা?

ও তার পুরু ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরে রহস্যময় হাসি হাসল। চোখে দুষ্টুমীর ঝিলিক! পিছন থেকে হাত নিয়ে এল সে। একখানি কাগজ আমার চোখের সামনে মেলে ধরে কচি মেয়ের আদুরে গলায় বলে উঠল,

—কাল রাত জেগে ছবি এঁকেছি। কেমন হলো রবীন?

নীল আকাশের পটভূমিকায় একটি সবুজ পাতা ছাওয়া ডাল। তার মাঝখানে মস্ত একটি প্রস্ফুটিত শুচি শুভ্র ম্যাগনালিয়া গ্র্যাণ্ডি-ফোরা। যেন রোজেনার মুখ।

—কেমন এঁকেছি রবীন? বলোনা!

—চমৎকার, রোজেনা। চমৎকার। হেসে ওর গভীর কালো চোখে চোখ রাখলাম।

চঞ্চলা মেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠে এবার হাততালি দিল না। সলজ্জ হেসে মাথা নোয়াল। মিহিস্বরে বলে উঠল,

—দাঁড়াও, এখুনি আসছি রবীন!

ছুটে বেরিয়ে গেল রোজেনা। ওর সুরভি ঘর ছেড়ে গেলনা। পরমুহূর্তেই হাঁপাতে হাঁপাতে এল। ওর হাতে ভাঙ্গা সদ্য ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার ডাল, পুরু চওড়া পাতার মাঝখানে আলো করা শুচিশুভ্র পূর্ণতায় বিকশিত ফুল।

—আমার ফুলবাগানে প্রথম ধরেছে, রবীন! উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে রোজেনা, ম্যাগ্‌নোলিয়া ডাল আমার হাতে দিয়ে উচ্ছাসে চঞ্চল হয়ে উঠল সে,

—তুমি নাও রবীন!

কী তাজা সুবাস! ম্যাগ্‌নোলিয়ার আর রোজেনার। মস্ত ফুল। সুখ-স্পর্শ বড় বড় পুরু পাপড়ি যেন রোজেনার গাল।

—ছবিটা আমায় দাওনা, রোজেনা!

—নেবে? তাই নাও রবীন! রোজেনা বিকশিত ফুলের মত স্বচ্ছ হাসি হাসে।—কিন্তু একটা কাজ করতে হবে তোমাকে রবীন, একটু পাহাড়ে উঠতে হবে!

—পাহাড়ে? এখুনি?

—হ্যাঁ এখুনি! রোজেনা আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়, আমার মনে মাদকতা ছড়ায়।—আমাদের স্কুলের এক বন্ধুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আজ বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি বন্ধুকে। ও লালফুল খুব ভালবাসে। পাহাড়ে উঠলেই অনেক রডোডেনড্রন্ গাছ পাবে রবীন। লালফুল ফুটে আছে অফুরন্ত। যাবে?

—তাই চল, রোজনা। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

আহা! এ কোথায় এলাম! কী নিবিড় বাধা-বন্ধনহীন নির্জনতা। পাহাড়ের চূড়ায় জায়গাটা সমান। এরপর শুরু উঁচু পাহাড়ের সারি। আমার ডান-

দিকে শত শত রেড পাইনের গাছ সমান্তরাল রেখায় যেন সাজিয়ে রেখেছে কেউ। কী ঘন সবুজ পাতা। ভোরের রোদ সেই পাতা থেকে ঠিকরে পড়ছে, পিছলে পড়ছে। কেমন এক দূরাগত হাওয়ার ধ্বনি। ঝির ঝির ঝির ঝির বাতাসে ঘন সবুজ পাতার অন্তরালে অব্যক্ত জীবনবেদনার সুর।

তোমার ডাইনে বাঁয়ে অনবরত কিচিরমিচি করছে অজস্র ছোট ছোট পাখী। চোখ মেলে শুয়ে সবুজপাতার ঝালরের ফাঁকে নীল আকাশের হাসিমুখ দেখতে দেখতে এবার উঠে বসো তুমি! বাঁ দিকে ঢালু গা বেয়ে এগোও! লালচে পাইন পাতার আস্তরণে তোমার পা পিছলে যাবে বারবার। আরো সামনে হঠাৎ দেখবে মাটিতে যেন উৎসব লেগেছে—অগণন সাদা হলুদ নীল বনফুলে ছেয়ে গেছে মাটি। নীচ থেকে ক্ষীণস্রোতা ঝর্ণাধারার ঝিরঝির একটানা চলার সংগীত শুনতে পাবে। হঠাৎ দেখবে একটি গোবেচারী কাঠুরে কি ঘাস-কাটা-কুলি চোখভরা বিস্ময় নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি হাসলে সেও হাসবে। তুমি বলবে ফুল নিতে এসেছো সে পথ দেখিয়ে দেবে। তুমি বিপজ্জনক উৎরাই বেয়ে নীচে নামবে। পাইনের পাতায় পা পিছলে যাচ্ছে তোমার। জুতোটা খুলে নিতে হবে তোমাকে।

নীচে ঝর্ণার মুখে এসে দাঁড়ালে তুমি। টলটল কালোজল ছুটে চলেছে গান গেয়ে। তুমি চোখেমুখে সেই ঠাণ্ডা শান্তির জল দিলে, পেরিয়ে গেলে ঝর্ণাটা পাথরের উপর পা দিয়ে। এবার কী নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন দুপুর রোদে। ঝর্ণার গা ঘেঁষে মাটির পথ, সূর্যের আলো পড়ে না সেখানে। হঠাৎ তোমার গা ছম্ ছম্ করে উঠবে। বাঁপাশে জঙ্গলঘেরা খাদ, ডানধারে লম্বা ফার্ণ পাতার নিবিড় জংগল, কেমন অদ্ভুত গন্ধ। পাশের কাঁটাগাছের ডাল এসে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে। তোমার কাপড় ছাড়িয়ে নিতে বেশ লাগবে খানিকক্ষণ। হঠাৎ বাঁ-পাশে কয়েক হাত দূরে একটা প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করে থমকে দাঁড়াবে তুমি। সাপ। প্রকাণ্ড পাহাড়ী সাপ, বিচিত্র রঙের বাহার। ধীরে ধীরে পাক খেয়ে একটা গর্তে ঢুকেছে।

ঝর্ণার জলে ভেসে যাচ্ছে রাশি রাশি সাদা ফুলের স্রোত। হঠাৎ বনানীর বুক কাঁপিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে কঠিন শব্দ ঠেকবে তোমার কাণে—ঠক্ ঠক্ ঠক্। সেই কাঠুরিয়া গাছ কাটছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরবে সেই শব্দ,—ঠক্ ঠক্ ঠক্। শিশু মনের খুশীতে হঠাৎ তুমিও গলা চিরে বাঁশী বাজিয়ে উঠবে, তার প্রতিধ্বনি জাগবে অনেকক্ষণ ধরে, ডাইনে

বাঁয়ে—কুউ—কু উ—। এবার জোরে হেসে উঠলে তুমি—সীমাহীন নির্জনতার বুকে সবদিক থেকে জাগছে সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি।

তুমি এগোবে। বাঁয়ে নীচে ঝর্ণার কলতান, ডাইনে পাহাড় নীরবে উঠে গেছে কোথায়, স্বর্গে। ডাইনে তাকিয়ে তোমার চোখ ঝলসে যাবে এবার। নতুন পাইন গাছে ছেয়ে গেছে পাহাড়ের ঢালু জমি। সবুজ পাইনের হাহা প্রাণখোলা অট্টহাসি। তুমি কাঁদতে যাবে। হঠাৎ বাঁক ঘুরতেই দেখবে তোমার পৃথিবী লাল হয়ে উঠল। রডোডেনড্রন্। অজস্র গাছে লাল ফুল ফুটে আছে তোমার প্রতীক্ষায়। তোমার প্রিয় মানুষকে দাও পৃথিবীর যৌবনরঙে রাঙা রক্তবরণ ফুল।

তোমার দু'চোখ অকল্পনীয় শান্তিতে নিবিড়তম প্রাণের আরামে বুজে আসবে। সবকিছু ভুলে যাবে তুমি। সুখ, দুঃখ, যুদ্ধ, হিংসা, রক্তারক্তি, কুটিলতা, জরা, যন্ত্রণা—সব, সব! শুধু সবুজ পৃথিবীর উজ্জ্বল আকাশের উচ্ছল প্রাণৈশ্বর্যের প্রাণকেন্দ্রে শুয়ে তুমি অমৃতের আস্বাদ অনুভব করবে তোমার সত্তার প্রতিটি পরমাণু দিয়ে। ···সেই বিপুল বিরাট অচিন্ত্যনীয় শান্তির মোহে তুমি আকাশে চোখ মেলে তাকাবে। মনে হবে সবাই জীবন্ত। আকাশ, মাটি, আলো। সর্বব্যাপী এক অনন্তসত্তার উপস্থিতি অনুভব করবে তুমি: ঐ দিগন্তে-মেশা নীল আকাশ যাঁর নয়নের পল্লব; আর উজ্জ্বল সূর্য যাঁর চোখের মণি, সেই প্রাণসত্তার সমগ্র রূপ কল্পনা করতে না পেরে নিগূঢ় শান্তির কোলে আত্মসমর্পণ করো তুমি···

তুমি নীচে নামতে থাকবে। ঝর্ণার জল লাল হয়ে উঠেছে ভেসে আসা রডোডেনড্রন্ ফুলে ফুলে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নীচে নেমেই কিন্তু আবার থমকে দাঁড়ালে তুমি। অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে উজ্জ্বল সাদা ফেনার মত জলরাশি, নীচে পাথরের পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক সপ্তবর্ণ রামধনু। লোভ সামলাতে পারলে না তুমি, পাথর ডিঙিয়ে ঝর্ণার পায়ের তলায় দাঁড়ালে—ফেনায়িত জলের বিন্দুকণা তোমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। তুমি শিশু হয়ে গেলে সেই নিঃসঙ্গ নিরালা মুহূর্তে,—রামধনুতে হাত রাখলে, তারপরে পা, তারপরে রামধনুর ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি!···অনেকক্ষণ। স্বপ্ন টুটবে। তুমি রাস্তায় উঠে আসবে। তোমার পা চলবে। কিন্তু মন চলবে না। এই প্রথম জানতে পারবে স্বর্গ স্বর্গে থাকে না, স্বর্গ আছে পৃথিবীতেই। শুধু তাকে খুঁজে নিতে হয়—

অস্তায়মান সূর্যের ম্লান গোলাপী আভায় আকাশ লাল। গেট-এ দাঁড়িয়ে রোজেনা। ছুটে এসে আমার হাত ধরল! যেন কেঁদে ফেলবে, উত্তেজনায় গলা বুজে আসে তার, কালো গভীর চোখ ছলছলিয়ে উঠে,

—রবীন! বেঁচে আছ তুমি? ওঃ, রবীন! রবীন!

—ভাগ্যিস আমায় পাহাড়ে পাঠিয়েছিলে, রোজেনা!

—চুপ ছেলে! বুড়ী বারান্দায় বেরিয়ে আসে।—আমরা ভয়ে মারা যাই। পতিরাম পাহাড়ে খুঁজে এসেছে দুবার। আবার গেছে লোকজন নিয়ে। বাঘ, সাপ, ডাকু,—কত ভয়। আছাড় খেয়ে হাত পা ভেঙ্গে পড়ে থাকে কতজন, নড়তে পারে না বাঘে শেয়ালে খেয়ে ফেলে। উঃ—

—কোথায় ছিলে রবীন? খাওনি? রোজেনা যেন জোরে আমার হাত টিপে আমার অস্তিত্ব অনুভব করতে চায়।

—তোমার বন্ধুরা কোথায় রোজেনা?

—সবাইকে বিদায় করে দিয়েছি। আরেকটু দেরী হলে আমিও বুঝি মরে যেতাম, রবীন!

—না, না, রোজেনা। ওরা যাক, কোন ক্ষতি নেই। এই ফুল তোমাকেই দিলাম তবে! লাল রডোডেনড্রন্-এর রাশ রোজেনার কবোষ্ণ কোমল হাতে তুলে দিলাম।

এরপর বৃষ্টি এল। নিবিড় ঘন সবুজে ছেয়ে গেল আমার পৃথিবী। যেদিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়। প্লাম পীচ নাশপাতির ডালে সবুজ পাতা ঝকমক করে। বাগানে বড় বড় ডালিয়া রাঙা হাসি ছড়ায়। আমার জানালার নীচে ভুট্টা গাছগুলি সবুজ লম্বা পাতা নাড়ে মনের আনন্দে। বর্ষার স্নিগ্ধ শ্যামল রূপে মনের শান্তি নিবিড়তর হয়ে ওঠে।.. কিন্তু আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। সারাদিন মাথা ঝিম্ ঝিম্, কপাল টন্‌টন্, জর জর ভাব। ভাল লাগে না কিছু। ঘুম আসে না। শুধু হিজিবিজি অতীতের দৃশ্যগুলো, যা আমি ভুলতে চাই, আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে ওরা হানা দেয়। নিরুদি অনুযোগ করেন,

—দিন দিন কী চেহারা হচ্ছে তোমার, রবীন? ডাক্তার দেখাও!

নিরুদির মুখের দিকে তাকালে চোখ মন জুড়িয়ে যায়। বর্ষাস্নাত শ্যাম-স্নিগ্ধ বনানীর কমনীয় ছায়া ওঁর চোখমুখ জুড়ে। বড় ভাল লাগে।

—কেন নিরুদি? আমার মনে গভীর শান্তি এখন। অশান্তি বাড়িয়ে

লাভ নেইতো।

. . .

এবার মুসলধারায় বৃষ্টি এল। দিন নেই রাত নেই নিশ্ছিদ্র কালো আকাশ কেঁদে চলে। ঝড়ো হাওয়ায় টিনের ঘর কেঁপে উঠে। আমার জ্বর বুকের ব্যথা বাড়ে। ভাল লাগে না অবিশ্রাম এ বৃষ্টি। ভাসিয়ে নিচ্ছে সব কিছু। বন্দী সবাই ঘরে। সাতদিন পর হঠাৎ বিকেলে বৃষ্টি থামল। আকাশের কালো বুক ফুটে উজ্জ্বল প্রাণমাতানো অথৈ নীল হেসে উঠল। অনেক দিনের হাওয়া রোদ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে মাঠে গাছে গাছে। যেন মৃত দেহে প্রাণ এল সবার, মানুষ পশু পাখি গাছপালা সবার। আর সহ্য হয় না বন্দীদশা। ছুটে বেরিয়ে এলাম।

হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াই পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণার সামনে। যেখানে ঝির ঝির মৃদুছন্দে জল ঝরতো সেখানে আজ প্রলয় নাচন ; যেন হাজার সিংহ তাদের কেশর ফুলিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে শূন্যে। যেন অফুরন্ত পেঁজা-তুলা কেউ বিরাট বিক্রমে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীচে ফেলছে। বোবা আনন্দে বিহ্বল হয়ে অব্যক্ত বেদনার পুঞ্জীভূত ভার বুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলাম আমি। দারুণ বর্ষার অবসানে শান্তি এল পৃথিবীর জীবনে।

আজ বহুদিন পরে গান ধরেছে মিস্ত্রিরা চাঁদের আলোয় গোল হয়ে বসে। গীটার মাউথ্‌অর্গ্যানের সুর সুরেলা বাতাসে স্বপ্ন ছড়ায়। গান গায় ওরা :

তোমার চুলে ঘেরা কচি মুখ
চাঁদের আলোয় ঝর্ণার জলের মত
ঝিকিমিকি হাসে, চুপিচুপি হাসে—
আর ধরতে গেলেই বোকা বনে যাই,
তোমার চুলে ঘেরা মিষ্টি মুখ—

আর ওপাশে নেপালীদের গান। ঢোল বাজে ডুডুম্‌ ডুম্‌ একঘেয়ে সুরে। জোয়ান সরল সহজ মানুষ গান গায় :

…দাই বলে নাইনা রেশম, ম'পনি বলুলা,
—ন বলে নাইনা রেশম, কিয়ালারি পরুলা।

ও-হো! ও-হ! ও-হ! কিয়ালারি পরুলা—
হো! হো! হো—ও! কিয়া লারি পরুলা···

আজ আর পড়ানো নয়। আজ স্বপ্ন দেখার রাত।···তবু জ্বর এল। বুকে ব্যথা। যা হয় হোক,! তবু আজ আমি স্বপ্ন দেখবো। এমন চাঁদনী রাতের মায়া, নীল আকাশ, সবুজ প্রাণে প্রাণে আকুল গাছের পাতা, ঝির ঝির বাতাস, জলে ভরা নদীর বিচ্ছেদহীন সাঁ সাঁ ধ্বনি, আর মানুষের গান! এই অফুরন্ত প্রাণের সুরে সুর মিলিয়ে যদি আমার জীবনদায়িনী রাগিনী সৃষ্টি করতে পারতাম—যৌবনের সবুজ রাগিনী···

—আহা! যদি পারতাম, যদি পারতাম!!

শুয়ে শুয়ে সবুজ আর নীল স্বপ্ন দেখলাম শুধু। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল বহুদিন পর মন নেচে উঠেছে আকাশের সঙ্গে তাল রেখে। হালকা মনে হচ্ছে শরীর। বাইরে এলাম। মাঠে লম্বা ছায়া ফেলেছে গাছগুলো। রোদে ঘাস খাচ্ছে সাদা কালো ছোপ লাগানো গরু। পতিরাম ওর গা ধুয়ে দিচ্ছে। রোজেনা ঘুমভাঙা চোখে এল, গরুর গলা জড়িয়ে ধরে,

—জানো রবীন? ও বাচ্চা দেবে শীগগিরই, কি মজা, না?

—হ্যাঁ, রোজেনা!

চারধারে শুধু সবুজ শান্তি। যেন শান্তির নেশায় আচ্ছন্ন আমার চেতনা। খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। আবার পাহাড়, উপত্যকা। রামধনু আঁকা ঝর্ণার পায়ের নীচে দাঁড়াই। বিকেলে নিরুদির বাড়ী পড়াতে যাই।

—তোমার কথা আর শুনছি না, রবীন, শান্ত ভাবে তাকাল নিরুদি,—কালকে ডাক্তার আসবে এখানে, তোমার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কি হয়ে যাচ্ছ তুমি দিন দিন?

—আমার শান্তি নষ্ট হোক এ আমি কেমন করে' চাইবো নিরুদি?

—কাল বিকেলে শীগগির এসো, ডাক্তারকে বলে দিয়েছি! শান্ত মধুর সুর ঝরে পড়ে নিরুদির কণ্ঠে।

আঃ, দিনভর কী হাল্কা স্বচ্ছন্দ ছিল শরীর। সন্ধ্যায় আবার মাথা ভার, বুকে টনটন্ ব্যাথা, শরীরে অবসাদ। রোজেনা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঁৎকে ওঠে,

—উঃ, তোমার চোখ গর্তে ঢুকে গেছে রবীন! কি রোগা হচ্ছ তুমি দিন দিন! দেখেছো ঞ্যামি!

বুড়ী আনাবেলা খাবার দিয়ে যায় আমাদের সামনে, সস্নেহচোখে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে ঝংকার দিয়ে ওঠে,

—কি ভেবেছো তুমি ছেলে? তোমার মাথার উপরে কেউ নেই বুঝি? কাল টের পাবে মজা—

—হলোজো মজা! আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে রোজেনা।

বড় ক্লান্ত। হু হু করে জ্বর এসেছে মাথাটা তুলে রাখতে পারছি না। কাশিটাও বেড়েছে আজ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনি। গীটার মাউথ্ অর্গ্যান আর ঢোল। সজীব সুরেলা কণ্ঠ জুড়ে শুধু যৌবনের গান—

অন্ধকার ঘরে শুয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে দৃষ্টিকে পাঠাই নীল আকাশে। দু'টি তারা দপ্ দপ্ করছে, ওরা আমার চোখের তারা হয়ে নীল আকাশের স্বপ্ন দেখুক সারারাত! কী প্রচণ্ড বাতাস…যৌবনদীপ্তা পৃথিবীতে আকুল দিশাহারা আনন্দে নিরবচ্ছিন্ন অট্টহাসি। হাওয়ার হা হা চীৎকার দিকে দিকে; আমার ঘরটা কাঁপতে থাকে। দরজা জানালা হাওয়ার চাপে কাত্রাতে থাকে।

অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে। খুব জ্বর। চোখ কান মাথা দপ্ দপ্ করছে অবিরাম। বুক ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ছে। আর কাশির সঙ্গে প্রাণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়িয়ে পড়তে চায়… তবু কত শান্তি। জানালার ওপারে তারা দুটো দপ্ দপ্ করে স্বপ্ন দেখে নীল আকাশে। যেন আমার চোখের তারা…আর গান গায় রূপালী জোৎস্নার সবুজ ছায়ায় মিস্ত্রি মজুরের দল আর পাহাড়ী নদী—

কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা যে! হাত পা সব কুঁকড়ে যাচ্ছে যে! মরে যাচ্ছি আমি? মাথা কেটে আগুন বেরুচ্ছে; বালিশ পুড়ে যাবে বুঝি! বুকের উপর যেন কালো দৈত্য একটা চেপে বসেছে। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকালাম আমি। জানালার ওপারে তারা দুটি অস্ত গেছে। শুধু চাঁদনীর আলোয় ছায়াচ্ছন্ন গাছ, শোনা যায় নদীর ঐক্যতান…। উঠতে চাইলাম, পারলাম না। চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম, পারলাম না। পুড়ে যাচ্ছে আমার শরীর। হঠাৎ বুক-উজাড় করা দুর্দম কাশি এল। নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলাম। বুকখানা বুঝি আর আস্ত নেই, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর মুখ ভরে বমি ছুটল। আমি বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারি না। কাশি আর বমি। বহুক্ষণ ধরে এই চলল। এক সময় কাশি থামল, বমিও নেই আর। শরীরে ঘাম ঝরছে

অবিরাম, মাথার ভিতরে ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে বিকট সুরে। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম নিঃসঙ্গ, অন্ধকার বিছানায়। জানালার ওপাশে চাঁদজাগা নীল আকাশ, জলস্রোতের ছন্দ—চেতনা বিবশ আমার।

অনেক পরে আধো তন্দ্রার মাঝে লোকের ব্যস্ত কথাবার্তা শুনতে পেলাম। ত্রস্ত ছোটাছুটি। উঠতে পারি না। গলা ফুটে স্বর বেরোয় না। পড়ে রইলাম জানালায় চোখ মেলে—চোখের সামনে চাঁদনী-ঢালা নীল, নীল, নীল—

অনেক, অনেক পরে জানালার ওপারের আকাশে লাল আভা ফুটে উঠল। বাইরে কারা কথা বলছে, দুপ্ দাপ্ চলছে ফিরছে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত হাল্কা হয়ে গেছে শরীর! যেন পেঁজা-তুলা মেঘের মত আমিও আকাশে যেমন খুশী উড়ে যেতে পারি। আমি জানালায় তাকিয়ে থাকি, ম্রিয়মান-চাঁদ বহু দূরের পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়ে…

এসো, প্রিয় প্রভাত, তুমি এসো। রাত্রি আমায় কত কষ্ট দিয়েছে দেখো এসে!

ধীরে ধীরে রোদ উঠে। কাঁচা সোনার বরণ প্রভাতী রোদে সামনের মাঠ ছেয়ে গেল। আমার ঘরেও রোদ। আমি বসে বসে নবজাতক বাছুরের নাচ দেখি। ওর সিল্কের মতন পালিশ চিক্কন চামড়া থেকে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, লেজ তুলে লাফাচ্ছে নবজাত শিশু!…পৃথিবীর একপারে জীবনের উন্মেষ —অন্যপারে মৃত্যুর অভিসার…

হঠাৎ ঘুমভাঙা এলোচুলে বারান্দা থেকে লাফ দেয় রোজেনা। পরনে লাল শালোয়ার, গায়ে লাল জামা। আলুলায়িত শুকনো ফেঁপে-ওঠা চুলের রাশ ওর চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যাগ্নোলিয়ার পাপড়ির মত নরম আলতো গালে চুলের গোছা দুলছে। ছুটে আসছে রোজেনা। উত্তেজনায় তার সবল সুঠাম বুক উঠছে নামছে জামার তলায়। কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রোজেনা, নবজাত বাছুরটাকে দুহাতে জাপটে ধরে বুকে তুলে নিল। খুশীর হাসিতে ছেয়ে গেল চোখমুখ। বাছুরটা ছটফট করছে, নীচে লাফিয়ে পড়তে চাইছে, আলুলায়িত রোজেনা সজোরে ওকে বুকে চেপে ধরে টলতে টলতে আমার ঘরের দিকেই ছুটে আসছে, চোখে মুখে হাসির বন্যা বাঁধ মানে না আর।

—রবীন! রবীন! ওঠো, দেখো এসে! সুতীক্ষ্ণ প্রাণবন্ত রোজেনার খুশীর সুর!

…এসো, এসো রোজেনা। তুমিও দেখে যাও আমারও যৌবন রয়েছে রোজেনা। কেমন রক্তরাঙা যৌবনের ফুল ফুটিয়েছি আমি সারারাত, দেখে যাও।

হোঁচট খেতে খেতে ছুটে আসছে রোজেনা, হাঁপাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, বিষম হাসছে। বন্দী বাছুর ওর বুকে লাফাচ্ছে—

—রবীন, রবীন, এসো, এসো!

তুমিও এসো, এসো রোজেনা। উচ্ছল যৌবন শুধু তোমার একার নয়। আমিও রক্তের অক্ষরে যৌবনের গান লিখে রেখেছি সারারাত। এইবার তুমি নাও রোজেনা!

ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠা এইমাত্র লেখা শেষ হয়েছে!

শান্তি-র বই

উপন্যাস ঃ

গৃহসন্ধানে
সুন্দর, হে সুন্দর
যেতে নাহি দিব
শিখারূপিণী
মৌসুমী সুর

গল্প ঃ

ঊর্মিমালা
রাজধানীর সূর্য

আলোচনা-গ্রন্থ ঃ

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথের পূরবী
রবীন্দ্রনাথের মহুয়া
রবীন্দ্রনাথের বলাকা (যং)
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা
জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র
বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ
সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি
আজ ও আগামীকাল (যং)

রম্যরচনা ঃ

পিছু ডাকে
ব্যাঙমা ব্যাঙমীর বৈঠক
কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি (যং)

বিশ্বসংস্কৃতি

গ্রন্থবার্তা

নাটক ঃ

ব্রতী
নাট্যাঞ্জলী (যং)

কাব্যগ্রন্থ ঃ

অচিরা
আশাবরী
আসন্ন (যং)
মেখলা (যং)

কিশোর-গ্রন্থ ঃ

মেঘ ও চাঁদ
ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প
মাইকেল মধুসূদনের গল্প (যং)
ভূতের পাঁচালি
অচিন ফুল (যং)